ছোটদের নতুন স্বাদের রঙিন মাসিক পত্রিকা

কিশোর দুনিয়া

দুটি ভিন্ন স্বাদের গল্প

কুইক কুইজ, রহস্য কুইজ

কেরিয়ার, পড়াশুনো

এবার আসছে ঘরে ঘরে রোবট

তুমি কি স্মার্ট?

এন্ট্রান্স পরীক্ষায় কেমন রেজাল্ট করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ?

■ জানুয়ারি ২০০২ ■ দাম : দশ টাকা

'কিশোর দুনিয়া'র প্রতি

আন্তরিক শুভেচ্ছা ও

অভিনন্দন

ডাঃ সুবীর বোস

অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ

(প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, রোটারি ক্লাব, কলকাতা)

'হাতে থাকলে মা-ও বকেনা,

হেড স্যারও বকে না!''

কিশোর দুনিয়া'কে

জানাই

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

টাটা ইনফোটেক

ডানকুনি হুগলী

'কিশোর দুনিয়া'র

জয়যাত্রা শুভ হোক

করুণাময় ঘোষ

গভ কন্ট্রাক্টর (সেচ ও জলপথ বিভাগ)

সিউড়ি, বীরভূম।

কিশোর দুনিয়া

জানুয়ারি . ২০০২ . Vol. I . Issue - 1

উপদেষ্টা মণ্ডলী

শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
শ্রী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
শ্রী সবিতেন্দ্রনাথ রায়
শ্রী পার্থ দে
শ্রী সুব্রত দাস

সম্পাদক

তাপস মুখোপাধ্যায়

সম্পাদনা সহযোগী

শ্রী গুনেন শীল, শ্রী তমাল লাহা, শ্রীমতী চিন্ময়ী দে,
শ্রী বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়, শ্রী তপন বারিক, শ্রী সৌম্য রায়,
শ্রী সঞ্জীব ভট্টশালী

বিজ্ঞাপন ও প্রচার

শ্রী শঙ্কর প্রসাদ চক্রবর্তী, শ্রী সুমিত ভট্টাচার্য, শ্রী শ্যামল ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও শিল্প নির্দেশনা

শ্রী তন্ময় দাস ও শ্রীমতী সুদীপ্তা দাস

অলংকরণ

শ্রী সুবল সরকার

মুখ্য পরিবেশক

শ্যামল বুক স্টল
টেমার লেন, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা - ৯

যোগাযোগ

কিশোর দুনিয়া
৯/৩ টেমার লেন, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০০০৯
ফোন - ২১৯-৬৬১১
ফ্যাক্স - ৩৩৭-৬৮৩৯
ই-মেল - Kishorduniya@rediffmail.com
তাপস মুখোপাধ্যায় ৯/৩ টেমার লেন কলকাতা - ৭০০০০৯ কতৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক লক্ষ্মীনারায়ণ প্রসেস ১৯সি/এইচ/৪ গোয়াবাগান স্ট্রীট কলকাতা-৭০০০০৬ হইতে মুদ্রিত। দাম ঃ ১০ টাকা

অসম্ভব মনে হলেও.....

'প্রথমে একটা ছোট হোটলের মালিক হব। তারপর একে একে এমন অনেকগুলো হোটেল কিনব যেগুলোর প্রত্যেকটি হবে বিশ্বের সেরা ফাইভ স্টার হোটেল।' — সিমলা শহরের 'সেজিল' হোটেলের বাইরে দাঁড়িয়ে নিঃস্ব ছেলেটি হোটেলের দিকে তাকিয়ে প্রায় অসম্ভব স্বপ্ন দেখল। পকেট হাতড়ে সে দেখল কয়েকটা মাত্র খুচরো পয়সা পড়ে আছে, যা দিয়ে সেদিনের খাবার জোটানোও অসম্ভব।

তারপরের ঘটনা রূপকথার মতো। সেদিনই সেই হাটেলে হুকুম তালিম করার কাজ পেয়েছিল ছেলেটি এবং তারপর শুধু পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায়ের ইতিহাস।

জানো কি তারপর কী হলো সেই ছেলেটির? শুনলে অবাক হতে হয় সেদিনের বাবা-মা হারানো ১৫ বছরের সেই কিশোর পরবর্তীকালে একে একে সিমলার কার্লটন হোটেল, কলকাতার গ্রাণ্ড হোটেল এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ফাইভ স্টার হোটেলের মালিক হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, লোকসভা ও রাজ্যসভারও সদস্য হয়েছিলেন তিনি। হ্যাঁ, তিনিই বিশ্ববিখ্যাত হোটেল ব্যবসায়ী এম. এস ওবেরয়।

এই ঘটনাটি উল্লেখ করলাম এই জন্য যে, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হলে এ ধরনের সত্য ঘটনা আমাদের অনুপ্রাণিত করতে সাহায্য করবে। যা প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয় সেই কাজও আমরা করতে পারি যদি আমাদের লক্ষ্য ঠিক থাকে, যদি আমরা উদ্যমী হই, যদি নিষ্ঠা ও সততা থাকে এবং সর্বোপরি অক্লান্ত পরিশ্রমী হতে পারি।

'কিশোর দুনিয়া' ছোটদের জন্য নতুন স্বাদের এক মাসিক পত্রিকা হিসাবে আত্ম প্রকাশ করল যা ছোটদের সত্যিকারের বড়ো হয়ে ওঠার জন্য প্রকৃত ও বন্ধু হয়ে উঠতে চায়

পত্রিকা কেমন হল তা তোমরা সকলে জানিও। তোমাদের প্রস্তাব ও পরামর্শ আমরা অবশ্যই বিবেচনা করব।

নতুন বছরের শুভেচ্ছা ও ভালবাসা রইল।

সম্পাদক

ছোটদের আকর্ষনীয় নতুন বই

■ লীলা মজুমদার সম্পাদিত
শ্রেষ্ঠ কমেডি অমনিবাস ৪০,

■ ডঃ নীরোদ বরণ হাজরার
সমুদ্রজয়ী বিজ্ঞানীদের দুঃসাহসিক অভিযান ৪৫
বিজ্ঞানী হতে চাও হাতে কলমে শিখে নাও ৩০,

■ ডঃ নির্মলেন্দু ভট্টাচার্যের
ছোটদের নজরুল জ্ঞানকোষ ২৫

আনন্দ প্রকাশন স্টল নং ৪২ ভবানী দত্ত লেন, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

সপ্তয়ন প্রকাশনীর উল্লেখযোগ্য বই

ভৌতিক গল্প সংকলন ঃ চার্লস ডিকেন্স-এর ভয়াল ভৌতিক গল্পের অনবদ্য সংকলন।
মমি ঃ শার্লক হোমস স্রষ্টা আর্থার কোনান ডয়েলের ভৌতিক গল্পের অনবদ্য সংকলন।

প্রাপ্তি স্থান ঃ **দীপালী বুক হাউস,**
১২/১ বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা - ৭৩

এক নজরে মাধ্যমিকের ব্যাকরণ

৪০ বছরের অভিজ্ঞ শিক্ষক
পার্থসারথি সিন্‌হা

মাধ্যমিকে বাংলায় ভাল ফল বা লেটার মার্কস পেতে হলে, "মাধ্যমিকের ব্যাকরণ" বইখানি খুবই প্রয়োজন। এই বইটির বিশেষ বৈশিষ্ট ঃ ১) সংজ্ঞা সহ ব্যাকরণের পাঠ্যসূচির প্রায় সব ও বইতে স্থান পেয়েছে। ২) পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ পৃথকভাবে সমাধান করা হয়েছে। ৩) মাধ্যমিক পরীক্ষার বিগত ১৫ বছরের প্রশ্নের সমাধান করা হয়েছে। ৪) কতিপয় সংজ্ঞার পার্থক্যনিরূপণ। ৫) পরিশিষ্ট।

হস্টাণ্ড ট্রেডিং কনসার্ন ৫৫ এম.জি. রোড, কোল - ৯ ✸ রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় কালীবাড়ী রোড, শিলিগুড়ি ✸ মালদা বুক কর্ণার অতুল মার্কেট, মালদা

★ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার দোকানেও পাওয়া যাবে। ★

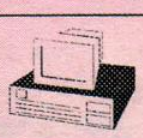

কম্পিউটারের বাংলা বই

কম্পিউটার শিক্ষার প্রথম পাঠ 'তাতোনের প্রিয় বন্ধু কম্পিউটার' ও কম্পিউটারের বিভিন্ন বিষয়ের উপর তিন শতাধিক প্রশ্নোত্তর সহ 'কম্পিউটার জিজ্ঞাসা'। দুটো বই-ই স্কুলপাঠ্য তালিকা ভুক্ত। এছাড়া আছে — ডস, উইণ্ডোজ, ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, অ্যাকসেস, ডিটিপি, FA, C++; অটোক্যাড, ভিস্যুয়াল ফক্সপ্রো, ফক্সপ্রো,ইন্টারনেট, ই-কমার্স, হার্ডওয়্যার এবং টেলিকমিউনিকেশন ইত্যাদি বাংলা কম্পিউটারের বইয়ের বিপুল সম্ভার।

কম্পিট্রনিক্স

৪১, বেনিয়াটোলা স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০০৫, শোভাবাজার, ফোন ঃ ৫৩০-৮১৫৫ ই-মেল ঃ mc j@vsnl.n t

এতে যা যা আছে

প্রচ্ছদ কাহিনী

এবারে আসছে ঘরে ঘরে রোবট
তাপস মুখোপাধ্যায় ৫

সময়টা দু'হাজার এক সাল। সকাল সাতটা। পশ্চিম লণ্ডনের পেডিংটন শহরের বিখ্যাত সেন্ট মেরি'স হাসপাতালে আজ চরম ব্যস্ততা। বেডফোর্ড শহরের সামান্য এক ছুতোর মিস্ত্রি কিথ মুর এই হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আছে ক'দিন ধরে। আজ আর একটু পরেই ক্যান্সারে আক্রান্ত চৌষট্টি বছরের এই প্রৌঢ়ের পেটে জটিল এক অপারেশন শুরু হবে। পেট কেটে অতি সাবধানে বের করে আনতে হবে একটি টিউমার.....

ভিন্ন স্বাদের গল্প

দাদা
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ১১

ভূতের চিরুনী
আবুল বাশার ১৮

বিশেষ রচনা

এন্ট্রান্স পরীক্ষায় কেমন রেজাল্ট করেছিলেন বিবেকানন্দ?
শান্তা শ্রীমানী ৯

ছড়া ও কবিতা ২৬-২৮

জিয়াদ আলী ❑ প্রমোদ বসু
❑ ভবানী প্রসাদ মজুমদার
❑ পঙ্কজ সাহা ❑ অগ্নি বসু
❑ ভবেশ দাশ ❑রাসবিহারী দত্ত
❑ তমাল লাহা

ছোটদের বিভাগ 'প্রতিভা'

কবিতা ঃ ঋতর্ষি দত্ত ❑পৃথা চক্রবর্তী ❑ সাগ্নিক চট্টোপাধ্যায় ❑ সায়ন্তনী সেন
আঁকায় ঃ তনুজ দত্ত ❑ প্রীতি দে ❑ ইন্দ্রিতা দে।

প্রবন্ধ

মহাবিশ্বে পৃথিবীর জীবেরা কি একা!
❑ ভবানী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৫৩

বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তি

বিজ্ঞানের লেটেস্ট খবর
❑ সৌম্য রায় ৪১
ইন্টারনেট Zone
❑ তপন বারিক ৪২

জেনারেল নলেজ এ্যাণ্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

পতাকা কীভাবে এলো
❑ গুনেন শীল ৪৪

বিশ্বের নানান খবর

❑ চিন্ময়ী দে ৩৭

ছবিতে গল্প

❑ বস্তার মধ্যে বুদ্ধি ২৯

ছবিতে রহস্য কুইজ

অদ্ভুত মালিক ৩৮

❑ তুমি কি স্মার্ট?
❑ পড়াশুনো
মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা জেনে রাখো
❑ বংশীবদন চট্টোপাধ্যায় ৪৭
❑ কেরিয়ার
কর্মজীবনের সুলুক সন্ধান
❑ কেরিয়ার মাস্টার ৩৬
❑ স্বাস্থ্য
ছোটদের দাঁতের সমস্যা
❑ ডাঃ দেবাশিস গুহ ৫০
❑ খেলাধুলো
রূপকথার নায়ক মাইকেল ওয়েন
❑ সুজন ঠাকুরতা ৩৯
❑ আই.কিউ.টেস্ট ৩৩
❑ জোকস ঃ প্রবীর চক্রবর্তী ৪৯
❑ শব্দ ছক ৫৬
❑ উত্তর মালা ৫৫

গতকালই আমি জানতে পেরেছি আগামী জানুয়ারি মাস থেকে ছোটদের উপযোগী দারুণ এক রঙিন মাসিক পত্রিকা 'কিশোর দুনিয়া' প্রকাশিত হবে। দীর্ঘদিন ধরে ছোটদের উপযোগী সত্যিকারের ভাল পত্রিকার অভাব রয়েছে। আশাকরি 'কিশোর দুনিয়া' এই অভাব মিটিয়ে দেবে। পত্রিকার সাফল্য কামনা করছি।

রত্নদীপ হাজরা
পোঃ অবিনাশপুর, বীরভূম

আজকের কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী নতুন ধরনের সম্পূর্ণ রঙিন একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হতে চলেছে জেনে এই চিঠি লিখছি। নতুন এই 'কিশোর দুনিয়া' পত্রিকায় জেনারেল নলেজ, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, বিজ্ঞানের লেটেস্ট তথ্য থাকবে শুনে দারুণ রোমাঞ্চ অনুভব করছি। এই ধরনের ভালো একটি পত্রিকা আমাদের দারুণ কাজে লাগবে।

পত্রিকাটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় রইলাম

মালিনী দে
প্রতাপ বাগান
পোঃ ও জেলা ঃ বাঁকুড়া

আমি নবম শ্রেণীর ছাত্র। স্কুলের পড়াশুনোর ফাঁকে আমি গল্পের বই ও ম্যাগাজিন পড়তে ভালোবাসি। ছোটদের নামকরা সব ম্যাগাজিনইআমি পড়ি। কিন্তু ইদানিং সেই সব ম্যাগাজিন আর আমাকে তেমন আকর্ষণ করে না। সম্প্রতি বিজ্ঞাপন পড়ে জানতে পারলাম জানুয়ারি মাস থেকে নতুন ধরনের একটি মাসিক পত্রিকা 'কিশোর দুনিয়া' প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকায় গল্প, কবিতা ও বিশেষ রচনা ছাড়াও বিশ্বের নানান খবর ও বিজ্ঞান, তথ্য-প্রযুক্তির লেটেস্ট খবর থাকবে শুনে পত্রিকাটির গ্রাহক হবার ভীষণ আগ্রহ হচ্ছে। পত্রিকাটি ছোটদের কাছে দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠবে বলে আমার বিশ্বাস। অনুগ্রহ করে আপনি যদি কীভাবে গ্রাহক হওয়া যায় এবং পত্রিকাটি কীভাবে পেতে পারি তা জানান তাহলে খুব ভালো হয়।

সৌরভ চক্রবর্তী
সল্টলেক

আমাদের স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের কাছ থেকেই প্রথম 'কিশোর দুনিয়া' সম্পর্কে জানতে পেরে আমরা কয়েকজন বন্ধু এই পত্রিকার ইতিমধ্যে গ্রাহক হয়েছি। শুনেছি জানুয়ারি মাস থেকে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হবে। পত্রিকাটিতে সাহিত্যের নানা বিষয় ছাড়াও পড়াশুনো ও কেরিয়ার গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ খবর থাকবে শুনে উৎসাহিত হয়েছি। এছাড়াও মজার কমিকস্, ছবিতে রহস্য কুইজ, আই.কিউ টেস্ট, তুমি কি স্মার্ট, ও শব্দছক থাকার খবর শুনে পত্রিকাটি সম্পর্কে আমাদের দারুণ আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। আর একটা কথা, আমরাও গল্প, কবিতা লিখি। আমাদের অনেক বন্ধু ভালো ছবি আঁকে। 'কিশোর দুনিয়া' পত্রিকার 'কিশোর প্রতিভা' বিভাগে প্রকাশের জন্য কয়েকটি ছবি পাঠালাম। প্রকাশিত হলে দারুণ খুশি হব।

প্রীতি দে
বর্ধমান

আমি ক্লাস টু'তে পড়ি। গল্প ও কবিতা পড়তে আমার খুব ভালো লাগে। আমার বাবা আমাকে 'কিশোর দুনিয়া' পত্রিকার গ্রাহক করে দিয়েছেন। শুনেছি বুকপোস্টে প্রতিমাসে আমার নামে এই ম্যাগাজিনটি আমাদের বাড়িতে আসবে। আমার খুব ভালো লাগছে।

আরিশা সাহা
নিউটাউন, কোচবিহার

প্রচ্ছদ কাহিনী

এবার আসছে ঘরে ঘরে রোবট

তাপস মুখোপাধ্যায়

সময়টা দু'হাজার এক সাল।

সকাল সাতটা। পশ্চিম লণ্ডনের পেডিংটন শহরের বিখ্যাত সেন্ট মেরি'স হাসপাতালে আজ চরম ব্যস্ততা। বেডফোর্ড শহরের সামান্য এক ছুতোর মিস্ত্রি কিথ মুর এই হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আছে ক'দিন ধরে। আজ আর একটু পরেই ক্যান্সারে আক্রান্ত চৌষট্টি বছরের এই প্রৌঢ়ের পেটে জটিল এক অপারেশন শুরু হবে। পেট কেটে অতি সাবধানে বের করে আনতে হবে একটি টিউমার।

কে করবে এই অপারেশন? দক্ষ ও অভিজ্ঞ কোন সার্জেন নিশ্চয়ই?

মিথ মুর আজ ভোর থেকেই সামান্য চিন্তিত। তিনি জেনে গেছেন, কোন দক্ষ ও অভিজ্ঞ সার্জেন নয়, যিনি তার পেটের ওপর অবলীলায় ছুরি চালাবেন তিনি শুধু অনভিজ্ঞ নন — একেবারে নবীন। জীবনের প্রথম অপারেশনটাই তিনি আজ করবেন।

সেদিন ঝুঁকি নিয়েছিলেন মুর এবং অবিশ্বাস্য শোনালেও সেদিনের সেই অপারেশন শুধু সফল ও নিখুঁত ছিল না — যুগান্তকারী একটি সাফল্যেরও সূচনা করেছিল।

যেভাবে গতানুগতিক অপারেশন করা হয় অর্থাৎ কাঁচি দিয়ে পেটের ছ'ইঞ্চি কেটে টিউমার বের করে আনা, ঠিক সেভাবে হয় নি এই অপারেশন। মাত্র একটা ফুটো করে বের করে আনা হয়েছে টিউমারটিকে।

অপারেশনের মাসখানেক পরে নিজের বাড়িতে বসে মুর জানিয়েছেন, "সত্যি! আমার জীবনে এই অপারেশন একটি আশ্চর্য ঘটনা। অপারেশনের পর জ্ঞান ফেরার পর থেকে আমার পেটে কোন অস্বস্তি বা অসুবিধে হয় নি। এমন কী আজ পর্যন্ত আমাকে একটা ব্যথা নিবারক ট্যাবলেটও খেতে হয় নি। কয়েকদিন হল আমি ভারী কাজ করতেও শুরু করেছি।"

সেদিনের সেই টিউমার অপারেশনটি স্বাভাবিক ও সাধারণ এক অপারেশনের মত মনে হলেও আসলে সেই অপারেশনটি এক যুগান্তকারী ঘটনা এইজন্য যে, সেদিনের সেই সফল অপারেশন যিনি করেছিলেন সেই অনভিজ্ঞ, নবীন সার্জেন আর কেউ নন — একটি অত্যাধুনিক রোবট এবং এই রোবট সার্জেনের নাম দ্য ভিঞ্চি।

এই ঘটনা সদ্য একবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ঘটলেও গত শতাব্দীর প্রথম থেকেই বিজ্ঞানীরা রোবট নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করেছিলেন। প্রথম দিকে ব্যাপারটা শুধু গবেষণা ও তত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৫৪ সালে প্রথম মানুষের তৈরি রোবট সৃষ্টি করলেন প্রখ্যাত প্রযুক্তিবিদ্ জর্জ ডেবল এবং এরপর থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও আরোও উন্নত রোবট সৃষ্টির কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল।

কুইক কুইজ

ইংরাজী 'সেরিব্রাল' কথাটি শরীরের কোন অঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত?

ক) লিভার খ) ব্রেন গ) স্টমাক ঘ) স্পাইন

উত্তর ৫৫ পৃষ্ঠায়

রোবট কথাটা এসেছে ইংরাজ ROB- OTA শব্দ থেকে। আর এই রোবট শব্দ প্রথম ব্যবহার করেন চেকোশ্লোভাকিয়ার একজন নাট্যকার, যাঁর নাম চিপক কারেল। তিনি তাঁর নাটকে এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। রোবট কথার অর্থ হচ্ছে — শ্রমিক।

রোবট এমন একটি যন্ত্র যার মস্তিষ্কে রয়েছে একটি আধুনিক কমপিউটার। এই কমপিউটারে প্রোগ্রামিং করা রয়েছে বিভিন্ন ধরনের কাজের পদ্ধতি।এই কমপিউটারের প্রোগ্রামিং-এর উপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন রোবট বিভিন্ন ধরনের কাজ করে। তারা মানুষের মত সমস্ত কাজ নীরবে করতে পারে। তবে সব রোবট মানুষের মত নয়। নানা আকার ও আকৃতির বিভিন্ন ধরনের রোবট আছে। এমনকী হাতের আকৃতিরও। মানুষের সময় ও পরিশ্রম বাঁচানোর সাথে সাথে নিখুঁত কাজ আদায়ের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হয়েছে এই রোবট।

বর্তমানে বিভিন্ন দেশের অসংখ্য বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ রোবট নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। পৃথিবীর কয়েকটি উন্নত দেশে বিশেষ কিছু কাজের ক্ষেত্রে রোবোটের ব্যবহার এখন খুব প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। কিছু কলকারখানায় অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিবেশে কিছু কাজ করার ক্ষেত্রে রোবট ব্যবহার করা হয়। এমন উচ্চ তাপমাত্রা বা বিষাক্ত রাসায়নিক নিয়ে সেখানে যন্ত্রমানবরা কাজ করে যে মানুষ সেখানে কখনোই কাজ করতে পারত না। এছাড়া কিছু বিশেষ ধরণের কাজ আছে, যা আগে শ্রমিকরাই করত আর পরে মানসিক ও দৈহিক অবসাদের শিকার হয়ে পড়ত। উন্নত দেশগুলিতে সেই সব কাজ এখন

হাঁটাচলা করতে অসুবিধে?
চিন্তা নেই, রোবট আছে

হ্যাঁ, স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করতে যাদের অসুবিধে হয় তাদের জন্য আছে দারুণ এক সুসংবাদ।

বয়সজনিত অথবা চিকিৎসা জনিত কারণে যাদের হেঁটে চলে বেড়াতে বেশ অসুবিধে হয় তারা এবার থেকে নির্ভয়ে রাস্তাঘাটে চলা ফেরা করতে পারবেন অপেক্ষাকৃত সহজে ও স্বাভাবিকভাবে।

জাপানের টোকিওর প্রখ্যাত গাড়ি নির্মাতা হুণ্ডা মোটর কোম্পানী সেইসব বৃদ্ধ ও অসমর্থ ব্যক্তিদের কথা ভেবে শিগ্গির হাজির করতে চলেছে একটি রোবট-চালিত হাঁটার যন্ত্র। অত্যাধুনিক এই রোবট-যন্ত্রটিতে রয়েছে ছোট্ট একটি মোটর যা চারটে পেনসিল ব্যাটারীর সাহায্যে চলে। হাঁটতে শুরু করলেই স্বয়ংক্রিয় এই রোবটযন্ত্রের মোটরটি চালু হয়ে যায় এবং হাঁটতে অসমর্থ ব্যক্তিকে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে যেতে উদ্দীপ্ত করে। শরীরে এই যন্ত্রটিকে রাখার ক্ষেত্রেও কোন ঝামেলা নেই। হাঁটু ও থাই-এর উপরে বেল্টের সাহায্যে এই ছোট্ট যন্ত্রটিকে বেঁধে রাখার ব্যবস্থাও যেমন সহজ তেমনি যন্ত্রটি শরীরে কোন অসুবিধা সৃষ্টি করে না।

করানো হয় যন্ত্রমানব দিয়ে। ওয়েলডিং এর কাজ, যন্ত্রাংশ জোড়া দেওয়ার কাজ ব্যাপক ভাবে এখন করানো হয় রোবট দিয়ে। মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রেও রোবট এখন বহুল ব্যবহৃত। মানববিহীন মহাকাশযান চাঁদে ও মঙ্গলে অবতরণ করে তুলে আনে নুড়ি পাথরের টুকরো — সেও তো রোবটের সাহায্যেই। মহাকাশে ভাসমান মহাকাশ স্টেশনে জরুরি মেরামত করতেও সাহায্য নেওয়া হয় রোবোটের। এছাড়া অন্যান্য উন্নত দেশেও এদের ব্যবহার আছে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে প্রায় দু'লক্ষ এই এই ধরণের রোবটকে দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে।

কেবল শিল্প ক্ষেত্রেই তো নয়, বিনোদনের ক্ষেত্রেও রোবট এখন বহুল প্রচলিত। আমেরিকা ও জাপানে বিভিন্ন "অ্যামিউসমেন্ট পার্কে" রোবোটকে কাজে লাগানো হয় দর্শকদের আনন্দ দিতে। শুধু আমেরিকাতেই এই ধরনের রোবোটের সংখ্যা কয়েক হাজার। খেলনা রোবটের দুনিয়ায় তো গত কয়েক বছরে বিপ্লব ঘটে গেছে। বিভিন্ন ধরনের ও আকারের রোবোট-খেলনা এখন বাচ্চাদের আনন্দ দিতে তৈরি। বিদেশের বিভিন্ন খেলনা কোম্পানী এই নিয়ে রীতিমতো গবেষণা করে। জাপানের সোনি কোম্পানী গত বছর একটি রোবট কুকুর বাজারে ছেড়েছে। এর নাম "আইবো" ই-আর-এস-২১০। এটি একরকম নরম প্লাস্টিকের তৈরি। হাত, পা, মাথা, লেজ নাড়ে ঠিক আসল কুকুরের মতো। এই নড়াচড়ার জন্য আর দৌড়ে বা হেঁটে বেড়ানোর জন্য এই খেলনা রোবটে আছে ২০টি মোটর। নানারকম মৌখিক নির্দেশ এটি পালন করে। এর জন্য এর আছে ৩২ বিট (Bit) রাইস প্রসেসর, ৩২ মেগাবাইট মেমরি। চোখের কাজ করে দুটো রঙিন ক্যামেরা, কানের জন্য আছে মাইক্রোফোন প্রভৃতি। এই রোবোট-কুকুরটি চলাফেরা করে একটি বিশেষ ধরণের ব্যাটারির সাহায্যে।

যে কোন রোবোট মূলত তিনটি ধাপে কাজ করে। প্রথমে সেনসর যন্ত্রাংশগুলি প্রয়োজনীয় তথ্য রোবোটকে সরবরাহ করে। দ্বিতীয় ধাপে সেই সংগৃহীত তথ্যগুলি অন্য যন্ত্রাংশের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হয়। তারপর রোবটের কাছে নির্দেশ যায় কি করতে হবে। তৃতীয় ধাপে নির্দিষ্ট কাজের নির্দেশ রোবটকে দিয়ে বাস্তবে পালন করিয়ে নেয় পৃথক যন্ত্রাংশ।

প্রথম ধাপের সেনসর যন্ত্রাংশের মধ্যে পড়ে রোবটের গায়ে লাগান ভিডিও ক্যামেরা যা চারপাশের ছবি তুলে ও শব্দ রেকর্ড করে সিগন্যালে রূপান্তরিত করে রোবটের মধ্যের দ্বিতীয় ধাপের যন্ত্রাংশে পাঠিয়ে দেয়। এছাড়া রোবটে ম্যাগনেটিক সেনসর, লাইট সেনসর, টাচ সেনসর, প্রেশার সেনসর প্রভৃতিও ব্যবহার করা হয়। এগুলি প্রত্যেকটিই রোবটকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে। দ্বিতীয় ধাপের যন্ত্রাংশ বলতে বোঝায় মাইক্রো কম্পিউটারের সফটওয়্যার প্যাকেজ যা সংগৃহীত তথ্যের সিগন্যালগুলিকে বিশ্লেষণ করে রোবটকে কাজ করার নির্দেশ দেয়। তৃতীয় ধাপে বিভিন্ন মোটর কাজ আরম্ভ করে। রোবটের প্রত্যেকটি প্রত্যঙ্গ

গলার স্বর শুনে চিনে নেবে রোবট

ভীড়ে ভর্তি কোন হল ঘরের মিটিংএ বা কোন বড় কনভেনশনে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে যদি কেউ চাপা স্বরে কোন কথা বলে ফেলেন বা কোন বক্তা কোন বক্তব্য পেশ করেন তাহলে দূর থেকে ভীড়ের মধ্যে থাকা সঠিক বক্তাকে শনাক্ত করা বেশ কঠিন কাজ কোন সন্দেহ নেই। তার উপর এধরনের বিশাল সভা যদি নেতাজী ইণ্ডোরে হয় তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু অত্যন্ত কঠিন এই কাজটি অতি সহজে করে ফেলার জন্য অবশ্যই কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন জাপানের রোবট বিজ্ঞানীরা।

সম্প্রতি জাপানের এই গবেষকরা এমন একটি পদবিহীন স্বয়ংক্রিয় রোবট উদ্ভাবন করেছেন যা শুধু ভীড়ে ঠাসা জমায়েত থেকে বক্তাদের শনাক্ত করা নয় — হৈ-হট্টগোল ও গোলমালের মধ্যেও বক্তা বা প্রশ্নকর্তাদের ছবিসহ বক্তব্য তুলে ধরবে এই রোবট।

'সিগ' নামের এই গোয়েন্দা রোবটের মাথার দুপাশে বসানো মাইক্রোফোন ও অত্যাধুনিক ক্যামেরার সাহায্যে আশ্চর্য এই রোবট শুধু গলার স্বর শুনেই শনাক্ত করে নেবে প্রকৃত বক্তাকে।

চালনা করবার জন্য ৫/৬ টি করে মোটর লাগান থাকে। নির্দিষ্ট নির্দেশ বা সংকেত অনুযায়ী সেগুলি কাজ করে যায়।

ধারাবাহিক গবেষণার ফলে নিত্য নতুন উন্নতমানের রোবট এখন তৈরি হচ্ছে। শিল্প-বিজ্ঞান ক্ষেত্রে অথবা বিনোদন ক্ষেত্রেই রোবটের কার্যকলাপ আর সীমাবদ্ধ থাকছে না। বিভিন্ন ঘরোয়া কাজেও রোবটের ব্যবহার এখন দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন পরিশ্রম সাধ্য ঘরের কাজ, বাগান পরিচর্যার কাজ, বাড়ি পাহারা দেবার কাজ, অতিথি আপ্যায়নের কাজ — এসবই রোবট এখন করছে। এই নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চলছে। প্রযুক্তিবিদরা চেষ্টা করছেন আরো উন্নতমানের রোবট তৈরি করার — তাকে দিয়ে আরো বিভিন্ন রকম নতুন কাজ করানোর এবং বিশ্বের বিজ্ঞানী ও গবেষকদের মতে আর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে শুধু জাপান ও আমেরিকার মতো দেশে নয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ঢুকে পড়বে রোবট।

আর মাত্র কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। তারপর এখন যেরকম ঘরে ঘরে কমপিউটার ও ইন্টারনেট কানেকশন এসে বিশ্বকে ঘরের মধ্যে এনে দিচ্ছে ঠিক তেমনি দশ বা কুড়ি বছরের মধ্যেই হয়ত আমরা দেখতে পাবো আমাদের বাড়ির মধ্যে রয়েছে রোবট যে নিঃশব্দে আমাদের যাবতীয় কাজকর্ম করে দিচ্ছে। আর কোন কোন রোবট আমাদের খেলার সাথী হয়ে উঠছে। আমাদের সত্যিকারের বন্ধু হয়ে উঠছে।

রোবট অনেক ধরনের হয়। সাধরণভাবে আট ধরনের রোবটকে কাজ করতে দেখা যায়।

অটোমেশন রোবট ঃ এই ধরনের রোবটগুলি নিজেরা নিজে থেকেই কাজ করে। প্রোগ্রামিংএর মাধ্যমে যে ভাবে নির্দেশ দেওয়া থাকে সেইভাবে বিশেষ বিশেষ কাজগুলো এই রোবটগুলি নিঃশব্দে ও নিখুঁতভাবে পালন করে যায়।

অ্যানড্রয়েড রোবট ঃ এই ধরনের রোবটগুলি দেখতে অবিকল মানুষের মতো। মানুষের মতো শুধু আচরণ করা নয় — যাবতীয় কাজকর্ম এরা মানুষের মতো করে চলে।

সাইবোর্গ ঃ এই রোবটগুলি দেখতে অর্ধেক মানুষের মতো আর অর্ধেক রোবটের মতো। 'দি সিক্স মিলিয়ন ডলার ম্যান' চলচ্চিত্রে সাইবোর্গ রোবটকে প্রথম ব্যবহার করা হয়।

ড্রয়েড ঃ এই ধরণের রোবটগুলোর নিজেদের কিছু করার ক্ষমতা নেই। এই রোবটগুলো সম্পূর্ণ তার মালিকের আদেশ অনুযায়ী কাজ করে। মালিক যা যা নির্দেশ করবে ঠিক সেই কাজগুলো এরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। 'স্টার ওয়ারস্' চলচ্চিত্রে R-2D-2 ও C-3P-3 এই দুটি ড্রয়েড রোবটকে দেখা গেছে।

ড্রোন ঃ এই ধরণের রোবটগুলোকে শ্রমিক রোবট বলে। কোন জিনিস নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসার কাজেই তাদের ব্যবহার করা হয়।

প্রবোট ঃ এই ধরনের রোবট শুধু ব্যক্তিগত কাজেই ব্যবহৃত হয়। সাধারণত বাড়ির কাজকর্মের জন্য এই রোবট ব্যবহার করা হয়। 'ফরবিজন গ্রানেট' চলচ্চিত্রে এই ধরনের রোবট ব্যবহার করা হয়েছে।

রোবোট্রিক্স ঃ এগুলি হচ্ছে মহিলা রোবট। হাল্কা ও সূক্ষ্ম কাজগুলো এই রোবট দিয়ে করানো হয়।

সরোট ঃ এটি হচ্ছে বিনোদন রোবট। মানুষকে নির্ভেজাল আনন্দ দেবার জন্য এদের ব্যবহার করা হয়।

বিশেষ রচনা

এন্ট্রান্স পরীক্ষায় কেমন রেজাল্ট করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ?

শান্তা শ্রীমানী

মেট্রোপলিটন স্কুলের ক্লাসঘর। ক্লাস চলেছে পুরোদমে। মাস্টারমশাই পড়াচ্ছেন, পিছন দিকের বেঞ্চে বসে কয়েকটা ছেলে ফিস্‌ফিস্ করে গল্প করছে। সে দলের পাণ্ডা নরেন। গল্প করলে কি হবে, মাস্টারমশাই কি পড়াচ্ছেন সেদিকে ঠিক কান রেখেছে সে। ফিস্‌ফিস্ শব্দ শুনে হঠাৎ পড়ানো থামিয়ে মাস্টারমশাই নরেন ছাড়া সবাইকে এক এক করে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন কি পড়াচ্ছিলাম বল দেখি? কেউ উত্তর দিতে পারল না। সবাইকে বেঞ্চে দাঁড় করিয়ে শাস্তি দিলেন তিনি। এবার তাকালেন নরেনের দিকে। নরেনকে জিজ্ঞাসা করতেই সে গড়গড় করে মাস্টারমশাইয়ের পড়ানো অংশটা বলে যেতে লাগল। মাস্টারমশাই তো থ! কি ছেলেরে বাবা! চুটিয়ে গল্পও করছে আবার পড়ানোর দিকেও কান রেখেছে! ও সত্যিই অসাধারণ ছেলে। নরেন যখন সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে তখন তো তাকে আর শাস্তি দেওয়া যায় না। নরেনকে বললেন, 'বসে পড়।' কিন্তু নরেন বলল, 'না, আমাকেও বেঞ্চে দাঁড়াতে হবে। কেন না আমিই তো কথা বলেছিলাম সবচেয়ে বেশী।'

এরকম অসাধারণ ক্ষমতা নরেনের ছোটবেলা থেকেই ছিল। ছ'বছর বয়সে তাকে যখন বাড়ির ঘরোয়া পাঠশালায় ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল তখন সমবয়সীদের চেয়ে সে সব সময়েই এগিয়ে থাকত। যুক্তাক্ষর শিখতে সবার যখন লেগে যেত তিন মাস, নরেন সেখানে যুক্তাক্ষর শিখে নিল মাত্র তিনদিনেই। বিদ্যাসাগরের বোধোদয়, প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ থেকে পড়া দিলে সে একদিনেই গোটা বইয়ের পড়া তৈরি করে ফেলে। আবার ওই বয়সেই রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীও সুর করে পড়ে শোনাতো বাড়ির মা জ্যেঠীমাদের।

শুধু পড়াশোনাই নয়, তার সাথে ব্যায়াম, কুস্তি, জিমন্যাসটিকস্, গান-বাজনা কিসে যে তার আগ্রহ ছিল না তাই আশ্চর্য। তেমনি ছিল তার বুদ্ধি ও সাহস। কারোর বিপদে-আপদে আর কেউ যাক না যাক নরেনকে ঠিক পাওয়া যাবেই। একবার কলকাতায় এল 'সিরাপিস' নামের এক ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ। চৌরঙ্গীর অফিসে বড় সাহেবের কাছে দরখাস্ত করলে জাহাজ ঘুরে দেখার অনুমতিপত্র পাওয়া যায়। নরেন একাই চলল দরখাস্ত নিয়ে। কিন্তু এগারো বছরের ছেলেকে দারোয়ান তো কিছুতেই সাহেবের কাছে যেতে দেবে না। নরেন বেশি কথা না বলে অফিসের পিছনের ঘোরানো লোহার সিঁড়ি দিয়ে চুপিচুপি উঠে সাহেবের কাছে অনুমতি পত্র চাইল। তারপর সেটি হাতে দোলাতে দোলাতো বের হয়ে এল সদর দরজা দিয়ে। দারোয়ান তো তাজ্জব।

নরেনের বাবা বিশ্বনাথ দত্ত তখন রয়েছেন মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে। মা এবং ভাই বোনেদের সেখানে নিয়ে যাবে কে? কেন নরেন থাকতে ভয় কি? হ্যাঁ সেই সকলকে নিয়ে গেল নিজের দায়িত্বে। দু'বছর পর ফিরল কলকাতায়। বন্ধুরা সেবার দেবে এন্ট্রান্স পরীক্ষা। স্কুলের সাথে যোগ নেই তার দু'বছর। তবু ভয় পেল না। বসল সে পরীক্ষায়। মাধ্যমিকের সমতুল এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ৫১.২৫% নম্বর পেয়ে উত্তীর্ন হয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ। ১৮৭৯ সালের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তাঁর নম্বর ছিল এইরকম:

এন্ট্রান্স ১৮৭৯

পরেশনাথ দত্ত

সি এক মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশন

ইংরাজী	৪৭
বাংলা	৭৬
দ্বিতীয় ভাষা	৪৫
সংস্কৃত	৩৮
মোট	২০৬ - ৫১.২৫%

মেট্রোপলিটন স্কুলে পড়ার সময় একবার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের দিনে স্কুলের এক শিক্ষককে বিদায় অভিনন্দন জানানো হবে। সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখলেন দেশেবরেন্য নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছেলেদের কিছু বলতে বলা হল। ছেলেরা এ ওকে ঠেলাঠেলি করে। তখন এগিয়ে এলেন নরেন। আধঘণ্টা ধরে ইংরাজীতে বক্তব্য রাখলেন তিনি। বক্তৃতা শেষ হতে সভাপতি বললেন 'এমন তেজস্বী কণ্ঠস্বর, এমন দৃপ্ত বক্তৃতা জীবনে আমি খুব অল্প শুনেছি। এ ছেলে পৃথিবীর লোককে মুগ্ধ করবে একদিন।' সে কথাই সত্যি হয়ে উঠেছিল। সেদিনের সেই নরেনকে কি তোমরা চিনতে পারছ? তিনিই হলেন আমাদের পরিচিত স্বামী বিবেকানন্দ।

তুমি কি জানতে...?

মানুষের যত বয়স বাড়ে ততই সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো ভুলে যেতে থাকে কিন্তু পুরোনো ঘটনা সহজেই মনে পড়ে যায়।

গল্প

দাদা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

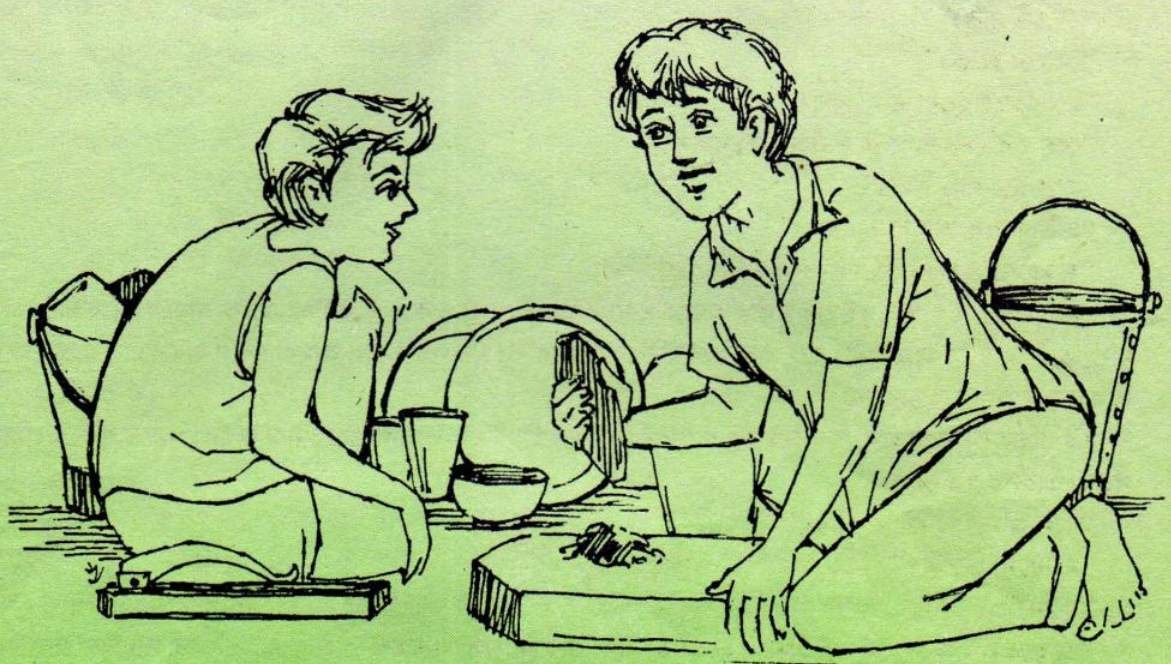

একতলা ছোট্ট একটা বাড়ি। ছোট্ট একটা উঠোন। দাদা আর আমি। হয়ে গেল। এর বেশি আর কিছু নেই। না, আছে। আমাদের একটা কুকুর আছে। তার নাম টম। টমও আমাদের ভাই। তার মানে আমরা তিন ভাই। আমি ছোট। আমি স্কুলে পড়ি ক্লাস এইটে। দাদা আমার চেয়ে বড়। কী বোকা আমি! দাদা যখন, তখন তো বড় হবেই। দাদা কলেজে পড়ে। আর বোধ হয় পড়তে পারবে না। দাদা হাসে আর বলে, "দ্যাখ তুষ্টু, ভগবানের বিচারটা একবার দ্যাখ। ঝপ করে দু'জনকেই নিয়ে নিলেন এক খাবলা মেরে। বল, একেই বলে এক ঢিলে দু'পাখি। তাই না! কেমন লাগে বল্!"

মা আর বাবা উত্তরভারতে তীর্থ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। বাস পড়ে গেল খাদে। বোঝো ঠ্যালা। ফিরতে হলো না। দু'জনে একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে ভগবানের কাছে চলে গেলেন। সবাই বললেন, "আহা! কী পুণ্যের জোর!" আমাদের আত্মীয় স্বজন বিশেষ কেউ নেই। কেন নেই তা আমি বলতে পারব না। এক বাউণ্ডুলে মামা আছেন তাঁকে আবার খুঁজে পাওয়া যায় না। দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর একদিনই এসেছিলেন অল্প সময়ের জন্য। আমাদের একটা কথাই বারে বারে বলে গেলেন, "ফাইট, ফাইট। বিষ্টু আর তুষ্টু, ফাইট, ফাইট।" বসে-বসে এক প্যাকেট সিগারেট খেলেন। জাহাজে কাজ করেন। লম্বা-লম্বা চুল। ব্রাজিলের খেলোয়াড়দের মতো। যাওয়ার সময় পকেট থেকে একটা বিলিতি লাইটার বের করে দাদার হাতে দিয়ে বললেন, "এটা রাখ। ইণ্ডিয়ায় এ জিনিস পাবি না। ফ্রান্সের জিনিস।"

দাদা বলল, "লাইটার দিয়ে আমি কী করব?"

"একদিন তো সিগারেট ধরবিই, তখন কাজে লাগবে।"

হনহন করে চলে গেলেন মামা। জাহাজি মামা। বেশিক্ষণ বসতে পারেন না একজায়গায়।

দাদা বলল, "তুষ্টু বরাত গুনে মামা পেয়েছি রে! এমন মামা কেউ কখনও দেখেছে! কবে সিগারেট খাব, আগেই লাইটারটা দিয়ে গেলেন। আমাদের জন্য কত ভাবেন একবার দ্যাখ।"

আমাদের কটা ইকমিক কুকার আছে। সোম থেকে শনি, কুকারই আমাদের খাওয়ায়। রবিবার আমরা দু'জনে রান্না করার চেষ্টা করি। শনিবার রাতে খাটে পাশাপাশি শুয়ে আমাদের প্ল্যান হয়। কলসির জল অনবরত গড়াতে গড়াতে ফুরিয়ে আসছে।

দাদা বলে, "তুষ্টু, জল কমছে। পাসবইটা দেখেছিস?"

"দেখেছি দাদা।"

"কী মনে হচ্ছে?"

"মনে কিছুই হওয়াচ্ছি না দাদা।"

"বেশ করছিস। ভাবলেই দুর্ভাবনা, কী বলিস?"

"একেবারে খাঁটি কথা।"

"প্রতিজ্ঞা কর, আমরা ভাববনা।"

"আমাদের ভাবনা কে ভাববে দাদা?"

"কে আবার, ভগবান! তুই শুধু টাকার অঙ্ককে খরচের অঙ্ক দিয়ে ভাগ করে সংখ্যাটা আমাকে জানাবি। তার মানে অত মাস। তারপর ভাঁড়ে মা ভবানী। যাক, কাল তো রবিবার কী হবে বল? সকাল-সকাল আমরা লেগে যাব রান্নার কাজে। কাল আবার জামাকাপড় কাচার দিন।"

এই প্রশ্নের কী উত্তর হবে, দাদা আমাকে আগেই বলে রেখেছে। "ভাল ভাল খাবারের নাম বলবি। গুনতে গুনতে ঘুমিয়ে পড়ব। তারপর স্বপ্ন দেখব।"

"কাল আমরা বিরিয়ানি করব।"

"মাটন, না চিকেন?"

"মাটন।"

"তা হলে কাল সকালে কী-কী কিনতে হবে শুনে রাখ। দেরাদুন চাল, কিশমিশ, কাজুবাদাম, সাজিরে, সামরিচ, জাফরান, জায়ফল, একভরি আতর। মাংসটা জ্যাকেরিয়া থেকে কিনিস। রেওয়াজি মাংস। ভাল ঘি কিনতে হবে এক কেজি। ফর্দটা মনে রাখ।"

দাদা আবার চাটনির ভক্ত। যা-তা চাটনি নয়। আলুবখরা, আমসত্ত্ব, খেজুর, কিশমিশের। গিজগিজে কিশমিশ। দাদা শেষে বলবে, 'একটু দই হলে কেমন হয়! ভালই হয়। তা হলে, শ'তিনেক টাকা নিয়ে তুই কাল সকালেই বেরিয়ে যাস।' প্রথমে দাদার হাই ওঠে, তারপর আমার। দু'জনে দু'পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ি। পান্তাভাতের একটা গুণ আছে। ভাল ঘুম হয়। সকালের ভাত আমরা জল দিয়ে রাখি। একটা পিঁয়াজ আর কাঁচালঙ্কা। তোফা খাওয়া। দাদা বলে, 'তুষ্টু খুব সাবধান। ভুঁড়ি হয়ে যাবে কিন্তু। ভুঁড়িওয়ালা লোক দেখলে মা খুব রেগে যেতেন। বাবার ভুঁড়ি ছিল। রোজ সকালে পদহস্তাসন করবি। কেমন!"

দাদা কয়লার গুঁড়ো কিনে এনে মাটি মিশিয়ে গুল পাকায়। এমনই কয়লার অনেক দাম। আমি সাহায্য করতে গেলে হাঁহাঁ করে ওঠে। "তোর হাত নষ্ট হয়ে যাবে তুষ্টু। তোর লেখাপড়ার হাত। বাবা বলতেন, আমার বড় ছেলেটা ভোঁতা, ছোটটা শার্প। তুই লেখাপড়া নিয়েই থাক। সংসার আমি সামলাচ্ছি। আমার যা হওয়ার হয়ে গেছে, আর তো কিছু হবে না।"

"তুই সর তো!" বলে আমিও গুল দিতে বসে যাই। তখন মজাটা আরও জমে ওঠে। দাদাতে-আমাতে কম্পিটিশন। কে কত বেশি দিতে পারে। কারটা বেশি গোল! কার ছেতরে গেল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সারা উঠোন ভরে যায়া গোল-গোল গুলে। দাদা নাম রেখেছে কালো রসগোল্লা! চারপাশে গুল, মাঝখানে যাওয়া আসার পথ। দাদা বলবে, "ডেকরেশনটা কেমন খুলেছে বল। আইসল্যাণ্ডের মতো গুলল্যাণ্ড। ক'শো টাকা রোজগার হল বল তো! তিন-চারশো!"

"রোজগার কোথায় হল দাদা! সবই তো খরচ!"

"তুই যদি এগুলো কিনিস তা হলে তো আমার রোজগারই হল। আর তোকে কিনতেই হবে, তা না হলে উনুন ধরাবি কিসে? এসব এসেনসিয়েল আইটেম। লিখে দে তুষ্টু-বিষ্টু ব্ল্যাকবল ফ্যাক্ট্রি।"

দাদা বলেছে, "তুষ্টু সব সময় আনন্দে থাকবি। কিসে দুঃখু রে! দুঃখুটা কিসের! চব্বিশ ঘণ্টা দিনের হিসেবটা ভুলে যা। মনে কর দিন একটাই। সব দিন একদিন। তা হলে কাল ভাল, আজ খারাপ মনে হবে না। সবই আজ। গতকাল, আগামীকাল আমাদের জীবনে নেই।"

দাদার এই আনন্দ বিরাট একটা দুঃখকে ভুলে থাকার চেষ্টা। আমাকে আনন্দে রাখার চেষ্টা। একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, দাদা পাশে নেই। ঘরের দরজা ভেজানো। চাঁদের আলো পাতলা কাগজের মতো মেঝেতে বিছিয়ে আছে। বসন্তকাল। বাইরে কোথাও একটা কোকিল পাগল হয়ে গেছে। ঘুমোতে পারছে না। গান এসে গেছে গলায়। তারস্বরে ডাকছে। আমি পা টিপে টিপে বাইরে এলুম। দাদা একা উঠোনে দাঁড়িয়ে।

"দাদা! কী করছিস তুই? একা-একা!"

দাদা তাড়াতাড়ি চোখ মুছল। কোনও উত্তর দিতে পারল না।

"তুই একা-একা কাঁদছিস!"

"কাঁদিনি তো! আজ রাতে পৃথিবীটা কী সুন্দর হয়েছে দ্যাখ! আনন্দে চোখে জল এসে গেছে!"

"আনন্দ! তোমার আনন্দ! সাদা চাদরে ঢাকা বাবা আর মায়ের দেহ দেখছ তুমি। সেদিনও এইররকম ভয়ঙ্কর একটা চাঁদনি রাত ছিল।"

আমিও কেঁদে ফেললুম। কী করব! মনে পড়ে যায় যে! দাদা এসে আমার কাঁধে হাত রাখল বন্ধুর মতো। শেষরাতে বসন্তবাতাসে, ফটফটে চাঁদের আলোয় সারা উঠোনে আমরা পায়চারি করতে লাগলুম। দাদাকে ঠিক আমার বাবার মতো দেখতে হয়েছে। ছোট্ট বাবা।

রবিবার সকাল। একপাশে তোলা উনুন, ঘুঁটে, খবরের কাগজ, কেরোসিনের বোতল, গুল নিয়ে দাদা উঠোনে বসেছে। আমাকে বলছে, "তুষ্টু, এক চান্সে উনুন ধরানো একটা শিল্প, বুঝলি! এক চান্সে একটা দেশলাই কাঠি জ্বালানো আরও বড় শিল্প। দেশলাই জ্বালাবার জন্য দেশলাইয়ের সঙ্গে আর একটা দেশলাই কেন দেয় না বল তো! এই দ্যাখ পরপর সাতটা কাঠি পড়ে আছে। ফুস করে জ্বলেই নিভে যাচ্ছে।"

দাদার মতো ছেলেমানুষ হয় না। রান্নাঘরের বাইরের দেওয়ালে একটা কাগজ ঝুলিয়েছে। বড়-বড় করে লেখা, টুডেজ মেনু ফর টু প্রিন্স অব ডিব্রুগড়। সানডে স্পেশ্যাল। বিরিয়ানি রয়াল। চাঁপ। স্যাল্যাড স্যাক্রাম্যান্টো। চাটনি চমকিলি। য়োগার্ট শশকুইটো।

"দাদা, তোমার শশকুইটোটা কী?"

"জানিস না? নতুন ইংরেজি। মশা যদি মসকুইটো হয়, শশা কেন শশকুইটো হবে না!"

"ঠিকই তো; কিন্তু এত জায়গা থাকতে আমরা ডিব্রুগড়ের প্রিন্স হলুম কেন?"

"ওই যে গড় আছে। প্রিন্সরা তো গড়েই থাকে রে! ডিব্রুগড়ে পেট্রল আছে পেটে। পেট্রল মানে লিকুইড গোল্ড। আমরা হলুম পেট্রল প্রিন্স। একটু সাবধানে থাকবি, আগুন থেকে দূরে। পেট্রল তো! ধপ করে ধরে যেতে পারে।"

সবচেয়ে কম দামের যে চাল, বাজার থেকে আমরা তাই কিনে আনি। দাদা নাম রেখেছে, গায়েগতরে চাল। ঘণ্টাখানেক ধরে ফোটার পর যখন ভাত হয়ে নামে, দেখার জিনিস, ইয়া মোটা-মোটা। যেন সেদ্ধ পেরেক। দাদা বলে, 'যত খাবি তত ওজন বাড়বে।' এই হল আমাদের বিরিয়ানি। দাদা বলবে, 'একটা ডালকে কতটা লম্বা করা যায় দেখ। একশো গ্রাম ডাল, এক গামলা জল। এর নাম ডালের কালোয়াতি। এর মধ্যে তুই পানকৌড়ির মতো ডুবে-ডুবেও খেতে পারবি।' বেগুনপোড়া আচ্ছা করে মাখা হল পেঁয়াজ আর ভাজা শুকনো লঙ্কা দিয়ে। দাদা আর আমি পোস্ত খুব ভালবাসি; কিন্তু ভয়ঙ্কর দাম। গরিবের খাদ্য, তাই দামটা বাড়িয়ে দিয়েছে, যাতে গরিবরা বড়লোক হয়ে যায়! রবিবারের খানায় পোস্ত একটা আকর্ষক পদ। শিলে পোস্ত বাটতে-বাটতে দাদা বলবে, 'কত ভাল ব্যায়াম দ্যাখ। বাইসেপ, ট্রাইসেপ, ফোর আর্মস। সব একেবারে ঠেলা

মেরে উঠছে।' নোড়া স্লিপ করে দাদা মাঝে-মাঝে শিলের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়ার মত হয়। আমাকে বলে, 'তুষ্টু রেসক্যু কর।' পেছন দিক থেকে আমি টেনে তুলি।

সেদিন দাদা ভাবতে বসল। বলল, 'ফিনান্স কমিটির মিটিং।' কমিটির সদস্য আমি আর দাদা। দাদা বলল, "চেয়ারম্যান সার, আপনার রিপোর্ট পেশ করুন। টাকার অঙ্ককে খরচের অঙ্ক দিয়ে ভাগ করার পর ভাগফল কি দাঁড়াল?"

"সাত।"

"তার মানে, আর সাত মাসের মতো রসদ আছে! তারপর?"

"তারপর ট্যাঙ্কে আবার নতুন জল ঢালতে হবে।"

"জল আসবে কোথা থেকে?"

"রোজগার করতে হবে।"

দাদা গুম মেরে বসে রইল কিছুক্ষণ। আমি জানি, দাদা সারাদিন পথে-পথে ঘোরে, কোনওরকম একটা চাকরির সন্ধানে। দাদার কলেজ টলেজ মাথায় উঠেছে। ক্লাস নাইনের একটা মেয়েকে পড়াত। তিনমাস মাইনে পায়নি। মেয়েটির বাবার অফিস বন্ধ হয়ে গেছে। তিনিও দাদার মতোই চাকরির সন্ধানে ঘুরছেন। দাদা লেখাপড়ায় স্কুলের সেরা ছাত্র ছিল। অসম্ভব ভাল পড়ায়। দাদা এখনও মেয়েটিকে পরম যত্নে পড়িয়ে চলেছে। একটাই কেবল তফাত হয়েছে, মেয়েটি বাড়িতে এসে পড়ে যায়। তাদের বাড়ির ইলেকট্রিক লাইন কেটে দিয়ে গেছে। দাদা বলে, 'মেয়েটা লেখাপড়ায় ভালো। ভালভাবেই পাশ করবে। মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে তাড়াতাড়ি চাকরি পায়। এই মেয়েটাও ভালো চাকরি পাবে একদিন। তখন আমার সব বকেয়া পাওনা ইনস্টলমেন্টে শোধ করবে। নিজের স্বার্থেই মেয়েটিকে পড়ানো উচিত।'

গোটাকতক টিউশনি ছাড়া দাদার আর কিছুই নেই। ট্রাউজার আর টি-শার্ট সম্বল। একজোড়া চটি আমসত্ত্বের মতো পাতলা হয়ে এসেছে। চটি কেনার কথা বললে, বলে, 'সে তো পুজোর সময়, এখন কী। পুজোর আগে চটি কিনলে, মা পাপ দেন।' ট্রাউজার আর শার্টটাকে নিয়মমতো কেচে তারে ঝোলায়। না শুকলে বাইরে বেরোতে পারে না। বলবে, "ভগবান দু'ভাই কেন করেছেন জানিস? এক ভাই বসে গেলে আর-এক ভাই চালু থাকবে।"

গুম মেরে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর হঠাৎ নড়েচড়ে উঠল, "তুষ্টু, আশার আলো দেখা গেছে।" দাদা এইরকম আশার আলো দিনের মধ্যে দশবার দেখে। কিন্তু দুঃখের বাতাসের এত জোর। আলো জ্বলতে-না-জ্বলতেই দপ করে নিভে যায়। নিমেষে অন্ধকার।

"কী আলো দেখলে দাদা? কেমন আলো?"

"এবার বেশ জোর আলো। একটা সাইকেল।"

"সাইকেলে তো আজকাল আলো থাকে না দাদা। কোন সাইকেলে তুমি আলো দেখলে?"

"ওরে, সাইকেলের আলো নয়, আলোর সাইকেল। আমার একটা সাইকেল চাই। একটা সাইকেল কিনব। পরিকল্পনাটা শোন, একেবারে ছবির মতো। প্রথমে সাইকেল চালানো শিখব। শিখতে ধর একমাস লাগবে। তারপর মন্টুবাবু আমাকে বলেছেন, খবরের কাগজের হকার করে দেবেন। ভোরবেলা উঠব, ডিপোতে গিয়ে কাগজ নেব। বাড়ি-বাড়ি দেব, সকালটার মধ্যে কাজ শেষ। বাড়ি আসব। তোর জন্য রান্না চাপাব তুই স্কুলে চলে যাবি। আমি চলে যাব কলেজে। টিউশনি করে দশটার মধ্যে ফিরে আসব। সাড়ে দশটা থেকে একটা পর্যন্ত পড়ব। তোর জন্য একজন গৃহশিক্ষকের খুব প্রয়োজন তুষ্টু। সেদিন আমাদের স্কুলের শিক্ষক বিধানবাবুকে ধরেছিলুম, 'সার, আমার ভাইটাকে একটু ফ্রি-কোচিং দিন না। মাইনে দেওয়ার ক্ষমতা তো আমাদের নেই। ছেলেটা বড় ভাল। একটু কোচিং পেলে দাঁড়িয়ে যাবে।' তা, কী বললেন জানিস?' 'বিষ্টু, ফ্রি-কোচিং কীরকম জানো, আমাদের আশ্রমের উৎসবে খিচুড়ি প্রসাদ দেয় দেখেছ! এতটুকু একটা ভাঁড়ে, একথাবা দলাপাকানো খিচুড়ি। ফ্রি-কোচিং ঠিক সেই রকম। প্রসাদী পড়ানোয় কাজ হয় না বিষ্টু।' আমার এত অপমান লাগল, কী বলব!'

"কাগজ বিলি করে তুমি ক'টাকা পাবে দাদা। ঝড়, জল, শীত, গ্রীষ্ম, তোমার শরীর।"

"দুর, কী যে বলিস! কত লোক করছে! জানিস তো, শরীরের নাম মহাশয় যা সওয়াবে তাই সয়। তোর পড়ার খরচটা

আমাকে তুলতেই হবে। জানিস তো, কাল কমল আমাকে বলছে, 'বিষ্টু, আমার সাইকেলটা বিক্রি করব, একজন খদ্দের দ্যাখ তো।' তিনশো টাকায় আমাকে দিয়ে দেবে। এত লোক থাকতে আমাকে কেন বললে? ভগবানের নির্দেশ। ভগবান ওকে দিয়ে আমাকে বলালেন।"

"তা হলে সাইকেলটা তুমি কিনবে?"

"তুই যদি টাকা দিস! তোর অনুমতি ছাড়া কিনব কী করে!"

"বেশ, তাহলে কেনো। এমনই বাড়িতে একটা সাইকেল থাকা ভাল।"

দাদা পরের দিনই সাইকেলটা নিয়ে এল। চেহারাটা বেশ ভালই। খুব একটা পুরনো নয়। দাদা বলল"তুই আমাকে শেখাবি। এমন কিছু ব্যাপার নয়। পেছনটা ধরবি, আমি হাফ প্যাডেল করব। প্রথমে হাফ, তারপর ফুল, তারপর সিটে উঠে বসব। সাতদিনেই পেকে যাব, কী বল?"

ভোর বেলা রাস্তা বেশ ফাঁকা। আমরা দু' ভাই আর আমাদের সাইকেল। আমি পেছনটা ধরে আছি, দাদা প্যাডেলে ওঠার চেষ্টা করছে। 'জয় মা' বলে উঠেও পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলটা ডান দিকে কাত হয়ে গেল। আমি দাঁত-মুখ খিঁচিয়েও টাল ধরে রাখতে পারলুম না। দাদা, আমি, সাইকেল, তিনজনেই হুড়মুড় করে পড়ে গেলাম। দাদা সাইকেলটাকে পাশবালিশের মতো করে ধরে পড়ে আছে। আমার দাড়িটা ঠুকে গিয়ে কেটে রক্ত বেরোচ্ছে। দাদার ডান পা সাইকেলের চেনের দাঁতে ফালা। কোনওরকমে দাদাকে সাইকেল থেকে ছাড়ালাম। নিজের পায়ের দিকে নজর নেই, আমার দাড়ি নিয়ে ব্যস্ত, " রক্ত যে রে!"

"তোমার পাটা দেখেছ?"

" কী জানিস, সাইকেল একটু রক্ত চায়। গিভ মি ব্লাড, আই উইল গিভ ইউ এ রাইড। এই কথাটা শুনিসনি বোধ হয় !"

"না দাদা, এমন কথা শুনিনি।'

"আজ শুনে রাখ।"

ক্ষত-বিক্ষত হয়ে দু'জনে ফিরে এলুম। আমার দাড়িতে স্টিকিং প্লাস্টার। দাদার পায়ে ব্যান্ডেজ। দাদা বলল, "বউনিটা বেশ ভালই হল। আজ পুষ্টিকর কিছু খাওয়া উচিত, বল? বেশ রক্ত বর্ধক!"

সেই পুষ্টিকর খাওয়াটা হল পুঁইশাক। এক কড়া পুঁইশাক নিয়ে বেলা দেড়টার সময় দু'জনে বসলুম। দাদা বলল, "দেখবি, এক বোতল রক্ত নেওয়ার কাজ হবে। পুঁইশাকের পুরোটাই রক্ত।"

সাতদিন সাইকেলটা পুরো বিশ্রাম পেল। রোজ ঝাড়া-মোছা চলতে লাগল। মোছার সময় দাদা জোরে-জোরে বলে, "এটা হ্যাণ্ডেল, এটা প্যাডেল, এটা গিয়ার, এটা চেন, এই হল দুটো চাকা, স্পোক, সিট।"

"তুমি এরিকম পাখি পড়ার মতো রোজ এইসব বলো কেন দাদা?"

"জিনিসটা ভালো করে চেনার জন্য। কোনও জিনিসকে তুই যদি ঠিকমতো একবার চিনে ফেলতে পারিস, তা হলে তাকে কব্জা করা সহজ হয়। বিজ্ঞান বলে, প্রকৃতির স্বরূপ বুঝবে, যেমন আগুনে হাত পোড়ে, ছুরিতে হাত কাটে, সেইরকম সাইকেল, নিজের দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই উল্টে পড়ে। তুমি দাঁড়ালে তবেই সে দাঁড়াবে। নিজের চলার ক্ষমতা নেই, তুমি চালালে তবেই সে চলবে। পান্নাদা আমাকে বলেছিল, 'সাইকেলকে আগে হাঁটাতে শেখ, তারপর চাপা শিখবি।' তাই ভাবছি, সাইকেলটাকে আজকে বেড়াতে নিয়ে যাব। দু'জনে মিলে মাইলখানেক হেঁটে আসব। তুই যাবি?"

"লোকে যে হাসবে দাদা।"

"তুই এখনো লোকের হাসি নিয়ে মাথা ঘামাস! তোর দুঃখে, তোরপ বিপদে লোক হাসবেই। কিছু করার নেই। নিজের দুঃখ দিয়ে মানুষকে একটু আনন্দ দিতে শেখ তুষ্টু। এই দুঃখের পৃথিবীতে তোর দুঃখ ছাড়া মানুষকে আনন্দ দেওয়ার আর কী আছে, বল! এই তো সেদিন, শুধু পুঁইশাক কিনে বাজার থেকে ফিরছি, আমাদের প্রাকাশবাবু দু'ব্যাগ বাজার নিয়ে পাশে-পাশে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'যাক, ওই জন্তু তো আজকাল কেউ পোষে না, তুমি তবু পুষেছ! কত বয়েস হল?' হেঁয়ালির কথা। বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলুম, 'কী বলুন তো?' তিনি বললেন, 'নিশ্চয় ছাগল পুষেছ, তা না হলে, এত পুঁইশাক খাবে

কে?' আমি বললুম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা নয়, একেবারে দুটো। তাদের আবার নাম আছে, বিষ্টু আর তুষ্টু। দুটোই পাঁঠা।' ভদ্রলোকের সে কী উল্লাসের হাসি। হা-হা হেসে বললেন, 'ছোকরা, তুমি তো বেশ রসিক হে!' তারপর বললেন, আজ বাজারে চিংড়ির আমদানিটা একবার দেখলে! দাম কিন্তু কমেনি! পঁচাত্তর। তাই কিনে ফেললুম এক কেজি।' আমি বললুম, 'চিংড়িটা আমাদের কিনতে হয় না। এমনিই পাই। ইংরিজি চিংড়ি। একটাই বহুবচন হয়ে যায়। মানে সিংগুলারে, প্লুরাল।' ভদ্রলোক বললেন, 'কী রকম- কীরকম?' আমি বললুম, 'উইটাকে খোলার মতো ছাড়ালেই চিংড়ি-উইচিংড়ি।' ভদ্রলোক আবার একটা অট্টহাসি ছাড়লেন। তারপর বললেন, 'মাঝে-মাঝে এসো না। আমাদের বেশ হাসিয়ে যাবে।' বুঝলি তুষ্টু, তুই কাঁদলে কেউ যদি হাসে, তা কাঁদ না একটু!"

রাত ন'টার সময় আমরা সাইকেল নিয়ে বেড়াতে বেরোলুম। লোকে সাইকেল চেপে বেড়ায়। আমরা সাইকেল হাঁটিয়ে বেড়াই। নির্জন পথ ধরে দু'জনে হাঁটছি। দোকানপাট সব বন্ধ। মানুষের বাড়িতে-বাড়িতে কত আলো, কত গান। পরদাফেলা জানালা। টিভির রঙিন আলো। প্রেসারকুকারের ফ্যাঁসফোঁস আওয়াজ। কেউ পড়ছে। কোথাও গটরা হচ্ছে। ভাই হাসছে। বোন হাসছে। বাবা হাসছেন, মা হাসছেন। আমরা চলেছি। একটা খেলার মাঠের পাশ দিয়ে পথ চলে গেছে গঙ্গার দিকে। সেখানে স্নানঘাট, শ্মশান। ঝুপড়ি বটগাছ। আমরা হাঁটতে হাঁটতে সেইদিকে চলেছি, রাতের অন্ধকারে সিমসিম করা খেলার মাঠটাকে বাঁ পাশে রেখে। প্রথম দিকে ভারী সাইকেলটা মাতালের মতো টাল খেয়ে, দাদার হাত' ধরে উলটে পড়ার তাল খুঁজছিল। প্যাডেলে পা ঘষটে যাচ্ছিল। শেষে দাদা বলল, "বুঝলি তুষ্টু, খোকা এবার বাগে এসেছে।"

আমরা সেই বটতলায় গিয়ে বসলুম। সামনেই গঙ্গা। বাঁ পাশে শ্মশানের উঁচু পাঁচিল।

সাইকেল নিয়ে বেড়াবার কষ্টে আমরা বেশ ঘেমে উঠেছিলুম। গঙ্গার ফুরফুরে বাতাসে শরীর জুড়িয়ে গেল। শ্মশানে মনে হয় একটা চিতা জ্বলছে। মাঝে-মাঝে পাঁচিলের ওপর লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছে আগুনের জিভ। দাদা বলল, "তুষ্টু, ওই সেই জায়গা। বাবা আর মা একসঙ্গে দুজনে পাশাপাশি, আগুনের বিছানায়।"

কথাটা বলেই দাদা স্তব্ধ হয়ে গেল। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে নিথর সাইকেল। বটপাতায় রাতের বাতাস খসখস করছে। আমরা দু' ভাই বসে আছি পাশাপাশি।

কতদিন হয়ে গেল। কত জল বয়ে গেল এই গঙ্গায়। ওই পথ ধরে আমি এখন একা হাঁটি। আমার দাদার সেই তুষ্টু আর আমি নই। আমি এখন তুষ্টুবাবু। সেই রাত। ঘরে থাকতে পারিনা। রাত ন'টা বাজলেই পথ আমাকে টানে। সিমসিম অন্ধকারে খেলার মাঠটার পাশে গিয়ে যখন দাঁড়াই, তখন শুনতে পাই আমার বালক বয়সের কণ্ঠস্বর। আমার বালক দাদার গলা, "তুষ্টু, বলটা ধর।" বটতলায় একা বসে থাকি কিছুক্ষণ। শ্মশান কখনও হতাশ করে না। পাঁচিলের ওপর আগুনের জিভ দেখা যাবেই। নিজেকেই নিজে বলি, "তুষ্টু, ওই সেই জায়গা। তিনজন, বাবা, মা, দাদা। আগুনের বিছানায়।"

সেই সাইকেলটাকে আমি সযত্নে রেখেছি। আমার দাদা। সিট থেকে দাদা নামছে। মাথায় একটা প্লাস্টিকের চাদর। ট্রাউজারে পা গুটনো। সামনের হ্যান্ডেলে অবিক্রীত কিছু খবরের কাগজ। সারা গায়ে জল ঝরছে। ফরসা মুখ বর্ষার জলে নীল। সাইকেল রাখতে-রাখতে বলছে, "তুষ্টু, একটা হল বটে। জলে সব ভেসে গেছে। সাইকেলটা একেবারে লঞ্চের মতো সার্ভিস দিচ্ছে।"

গভীর রাতে সাইকেলটা আমার সঙ্গে দাদার গলায় কথা বলে, "তুষ্টু, জীবনটাও সাইকেল। প্রথমে ধরে-ধরে হাঁটতে হয়, তারপর চড়ে বসে চালাতে হয়।"

সেরাকোটেশান্

যে হাত ঈশ্বরের প্রার্থনা করে তার তুলনায় যে হাত মানুষের সেবা করে তা বেশি পবিত্র।

জীবন এমনিতেই ছোট, অসতর্কভাবে সময়ের অপচয়ে একে আমরা আরো ছোট করে ফেলি।

প্রতিভা অসাধারণ ও মহৎ কাজগুলির প্রকাশ ঘটাতে পারে কিন্তু একমাত্র পরিশ্রম সেই কাজগুলিকে সফল রূপ দিতে পারে।

যারা পরিশ্রমী ও কর্মঠ তাদের ঘরে অনটন বা অভাব উঁকি মারতে পারে, কিন্তু ঢুকতে সাহস পায় না।

তুমি কতদিন বেঁচে থাকবে এটা বড় কথা নয়, তুমি কত ভালভাবে বেঁচে থাকবে এটাই বড় কথা।

শ্রমের ফসল পুঁজি; শ্রমের অস্তিত্ব না থাকলে কখনই পুঁজির অস্তিত্ব থাকত না।

গল্প

ভূতের চিরুনি

আবুল বাশার

জ্বর হলে ভূত দেখতে পেতেন দিনুখুড়ো, আবিরমামা গত্তিলালকে বলেছিলেন,জ্বর গায়ে দিনু দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করে গান গাইতেন। সবাই বলত, খুড়ো অমন করেই ভূত নামায়।

নীলকুঠির পুরনো দারোয়ান ছিলেন দিনু সিকদার। সাদা চামড়ার সাহেবদের নীলের ব্যবসা কবেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারাও স্বাধীনতার কত আগে কুঠি ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু কুঠিবাড়ির দারোয়ানি বজায় ছিল স্বাধীনতার পরেও। শেষের দীঘীর চৌধুরীরা কুঠি-এলাকার মালিকানা পেয়েছিলেন সাহেবদের কাছ থেকে। তাঁরাই দিনুখুড়োকে কুঠির দারোয়ানির চাকরিতে বহাল রেখেছিলেন সাহেবদের মতোই। খুড়োর ছিল সাড়ে সাতটাকা মাইনে। দিন বদলেছে, কিন্তু মাস মাইনে তাঁর বাড়ে নি।

কিছুকাল আগের কথা, কুঠির প্রকাণ্ড লোহার গেটের মুখে খুড়ো একটি পানবিড়ির দোকান খুলেছিলেন। দোকান চালাত ভাইপো সিধুচরণ। সন্ধ্যার মুখে ওই দোকান খুলত ভাইপোটা, দিনমান মাঠে খাটত।

শোনা যায়, দিনুখুড়ো সোয়াশো বছর বেঁচেছিলেন। দিনের বেলা কুঠির গেট খোলা, কিন্তু সূর্য অস্ত যেতে-না-যেতেই সেই গেট বন্ধ করে দিতেন সিকদার। লোক ঢুকতে পারত না। ভাইপোর পানবিড়ির দোকানে সারারাত টিমটিম করে কুপির আলো জ্বলত। গরুর ব্যাপারিরা রাতে পাকা সড়ক দিয়ে গরুর দল হাঁকিয়ে নিয়ে যেত সীমান্তের দিকে। বাংলাদেশে ওই গরু চালান যেত। তখনকার কালে বাংলাদেশের নাম ছিল পূর্ব-পাকিস্তান। সেই ব্যাপারিরা ওই দোকান থেকে পান বিড়ি কিনত।

মামা বলেছিলেন, কুঠি জায়গাটাই ছিল ভূতগ্রস্ত। ভূত এবং জিন কুঠিকে ঘিরে থাকত। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে গেটের কাছে ফিটনের ঝুমঝুম শবদ ভেসে উঠত। ব্যাপারিদের মুখে শুনেছিলেন আবিরমামা অশ্বের তীব্র হ্রেষাও নাকি শোনা যেত। মাঝে-মাঝে দারোয়ানের তকমা আঁটা দিনুর অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর উচ্চকিত হত। বাতাসে ভাসত বর্মা চুরুটের গন্ধ। ফরাসি আতরের উগ্র ঝাঁঝ, গোলাপ জলের ঠাণ্ডা হাওয়া গেটের সড়কে গোঁত্তা খেয়ে খেলে উঠত। মদির এই গন্ধও মিশে থাকত বাতাসে। বাতাসে কান পাতলেই শোনা যেত নারী পুরুষের চাপা গলার আলাপ। ভাঙা বাংলা আর চড়া হিন্দি মেশানো অদ্ভুত সাহেবি ভাষা, ব্যাপারিরা শুনেছে।

জ্বরের গায়ে দিনুখুড়ো সাহেব-মেমদের স্যালুট করছেন, ফিটন এসে ভিড়েছে গেটের মুখে, সে ভারি চমৎকার দৃশ্য। আপনা থেকে কড় কড় করে লোহার গেট খুলে যাচ্ছে, কুঠির ভিতর দালানের নাচঘরে ঝাড়বাতি জ্বলে উঠছে।

জ্বলন্ত বরফের মতো সাদা ঘোড়াগুলি ঝড়ের বেগে গাড়ি টেনে এসে পাথরের বড় গামলায় মুখ ডুবিয়ে জাবনা আর জল খাচ্ছে। এক মেম ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট হাতে ধরা, ঘোড়ার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

গায়ে জ্বর না এলে খুড়ো এইসব দৃশ্য দেখতে পান না। তিনি বলেছিলেন, "বুঝলে আবিরলাল, কুঠির বাগানে বাঁশবনের ওইদিকে একটা বুড়ো গো-জিন চড়ে বেনায়। গো-জিন কিনা বুঝবে কি করে? তাহলে তোমাকে ফাল্গুনের জ্যোৎস্নারাতে এখানে আসতে হবে। গো-ভূত আর গো-জিন ওরা হাড় খায়।

আবিরমামা একথা শোনা মাত্র আঁতকে উঠলেন ভয়ে, "হাড় খায়?"

খুড়ো তাজ্জব গলায় হেসে ফেলে বললেন, "হ্যাঁ বাপু, হাড়। মানুষের হাড়, কঙ্কাল খায়"

"কিন্তু এখানে কঙ্কাল কোথায় খুড়ো?"

"আছে বইকি আবিরলাল, কুঠি আছে আর মানুষের কঙ্কাল থাকবে না! কাউকে যদি না বলে ফ্যালো, তোমাকে দেখাতে পারি। খুব সাবধান! কথা যেন দু'কান না হয় আবির! আগে দ্যাখো, তারপর চেপে যাও। ফাল্গুনের পূর্ণিমায় এসো।"

আবিরমামার কাছে আমরা নানা ভূতের গল্প শুনে আসছি বরাবর। গত্তি আমার জ্যাঠতুতো দাদা, আমরা নাম কিরণ। আমার দু-চারটি ডাকনাম আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় বোধহয় চুনো।

মামা একদিন আমাকে শুনিয়ে বললেন,"শোন চুনো, কুঠি হলেই জানবি জায়গাটার নিশ্চয়ই বদনাম আছে। এককালে নীলকর সাহেবরা চাষিদের দিয়ে জোর করে নীলের চাষ করাত, ধান বুনতে দিত না। না খেয়ে মরতে হত চাষিকে। কোন চাষি অবাধ্য হলে তার হালের বলদ, জোত-জোয়াল সব ছিনিয়ে নিত নীলের সাহেব, পেয়াদা দিয়ে ধরে এনে এই কুঠিতে ভয়ানক মারধর করত। মারতে মারতে মেরে ফেলত পর্যন্ত। তারপর সেই মৃতদেহকে কোথায় যে ফেলে দিত।"

গত্তিদাদা বলল, "নীলের ব্যবসায় সাহেবদের খুব লাভ হত, তাই না মামা?"

মামা বললেন, "সাহেবরা ওই নীল চালান দিত বাইরে। মোটা টাকা লাভ করত। এদিকে চাষি সারা বছরের জন্য মুখের খাবার জোগাড় করতে পারত না। ধানের জমিতে নীল ফলাতে হলে ভাতের জোগাড় হয় কী করে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পন' নাটকে সাহেবদের সেই অত্যাচারের ঘটনা পাওয়া যায়। কী নিষ্ঠুর আর মর্মান্তিক!"

আমি প্রশ্ন করলাম, "ওই কুঠিতে কখনও ঢুকেছিলে তুমি?"

মামার মুখের রঙ কেমন একটুখানি বদলে গেল, অত্যন্ত গম্ভীর গলায় মামা বললেন, "হ্যাঁ চুনো, মাত্র একবার। সেই ফাল্গুনের পূর্ণিমার রাতে। যাকে বলে ফিনফোটা জ্যোৎস্না চারিদিকে টইটই করছে। আর বাজিতপুরের মাঠ পেরিয়ে ছুটে আসছে মন-কেমন-করা আশ্চর্য জোরদার হাওয়া। দিনুখুড়ো মাঠের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল,'মাঠে ভুলো নেমেছে।"

মাঠের ভিতর সত্যিই জ্যোৎস্নার ম-ম করা ধাঁধোশের সমুদ্রে দপ করে আলো জ্বলে উঠছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে বিলের পাড়ে কয়েকটা আলো ছোটাছুটি করছে, শুনেছি স্যাঁতস্যাঁতে ভেজা মাটিতে এক ধরনের গরম গ্যাস তোয়ের হয়, তাইতে আগুন জ্বলে ওঠে। দুদিন আগে ভাল জলঝড় হয়েছে, সে কারণে ভুলোর আমদানি হয়েছে।

এইসব যুক্তি পেশ করার পর আবিরমামা বললেন, "সবই বুঝতাম চুনো। কিন্তু দিনুখুড়োর গলার মধ্যে কি ছিল কে

জানে, ভুলোর আলো দেখে গা ছমছম করে উঠল। খুড়ো বললেন এই ধরনের রাতে গো-জিনদের মচ্ছব হয় আবির। এসো তোমাকে কঙ্কাল সরোবরে নিয়ে যাই।''

কঙ্কাল সরোবর কথাটাই কেমন ভয় ধরানোর মতো। হঠাৎ কুঠির দালানের পুরনো কাঠামো হাওয়ার আঘাতে মটমট করে উঠল বুঝি। লোহার গেট কড় কড় শব্দে খুলে যেতে লাগল।

''আপনিই খোলে নাকি খুড়ো?''

''তা খোলে বইকি! ঘোড়াগাড়ি ঢুকবে কি না! চোখে দেখবে না ঠিক, তবে কানে শুনবে। আগে এই শরবতটুকু খেয়ে নাও।''

''কেন?''

''বলছি খাও। প্রশ্ন কোরো না।'' বলে দিনুখুড়ো মস্ত গোল কাঠের টিপয়ে রাখা ঢাকনা ঢাকা গেলাসের শরবত হাতে করে তুলে ঢাকনা সরিয়ে আমরা সামনে এগিয়ে ধরলেন। বললেন, ''তুমি খাবে, আমি মন্ত্র পড়ব। ভয় পেয় না, এই রাতে যেসব ভূত আসে তারা কতক মিস্ত্রি, কতক বা হলোগে বাড়ি তৈরি করা এঞ্জিনিয়ার। এরা কেউ ফোরাত নদীর ধারে নগর গড়েছিল, কেউ পারস্যের মহল গড়েছিল। প্যালেস্টাইনে এরাই বানিয়েছিল ঐরাবত দুর্গের ধাঁচা। বাদশা সুলেমানের আমলে এদের বংশধরেরাই ময়ূরমহল নির্মান করেছিল। মনে রাখবে খাটিয়ে লোকেরা চিরকাল বোকা হয়। সেইজন্য ভূত বলতে জনগণকেও বোঝায়।''

''আপনি খুড়ো খুব শিক্ষিত লোকের মতো কথা বলছেন!''

''তা বলছি, কেননা সমস্ত কথা আমার মুখস্থ আছে। হাজারদুয়ারির গাইডরা যেরকম শিক্ষিত ভাষায় কথা বলে, আমিও সেইরকম বলি। কুঠির গাইড আমি, তা ছাড়া কালির অক্ষর আমরে পেটেও কিছুটা আছে। শেঠের দিঘির চৌধুরিরা আমাকে যে বহাল রেখেছেন, তার প্রধান কারণ এই পালিশ করা ভাষা। আমি তাদের বাড়ির বউদের পর্যন্ত গো-ভূত দেখিয়েছি। মাইনে সাড়ে সাতটাকা। কিন্তু বছরান্তে বাবুরা আমাকে ধানগম সাহায্য করেন, কুঠির সবজির একটা ভাগ পাই।''

একমিনিট চুপ করে থেকে খুড়ো বললেন,''এখানে কোন চাষি বসবাস করতে আসবে না। গো-জিন যেখানে থাকে, গরু ডরায় বাবা! শুধু ট্রাকটর দিয়ে চাষ করানো যায় বটে, কিন্তু চৌধুরীর ড্রাইভার সাহস করে নি। অগত্যা এই দিনুই ভাগজোত টেনে এই কুঠি আগলাচ্ছে। ভাইপোটাকে বলি, ওরে সিধে এখানের মন্ত্রপাঠ শিখে হাল ধর বাবা, তা সে ভয়েই আসে না।''

দম ফেলে খুড়ো মন্ত্র আওড়ে উঠলেন, ''ই আর কি, মুই আর কি ফট! সামনে ভূতের পট। তুমি দেখবা আবিরলাল?''

''আজ্ঞে!''ভয়ে মামার গলা শুখু-শুখু।

ঢোক গিলে মামা শুধালেন, ''কি দেখবে খুড়ো?''

''আগে গলা ভিজিয়ে নাও, তারপর সব হচ্ছে! ভূতের পট নিশ্চয় তোমাকে দেখাব। ওরা পট টাঙিয়ে দিয়ে গান গেয়ে ইমারত বানাত। নগর তৈরি করত। ইকড়ি মিকড়ি চিক। তিনি আছেন পচ্ছিম দিক।''

''তিনি কে?''

''আর কে! যে ভূতটা পট লেখে।''

''কোথা?'

''আর কোথা! ওই যে হোথা। চল দেখাচছি। আগে শরবত শেষ কর।''

ভয়ে মামা ঢকঢক করে গেলাসের শরবত খেয়ে ফেললেন। যদিও আবিরমামা ভূত ঠিক বিশ্বাস করেন না, তাঁর ধারণা মনের কোন ধরনের বিকার হলে ওই পদার্থ দেখা গেলেও যেতে পারে, সুস্থ মানুষ ভূত দেখে না। তবুও তাঁর ভয়ই করছিল। কুঠির দালানগুলো এমনিতেই পড়ো, পলেস্তরা খসা, লাল ছোট ছোট ইঁটের দাঁত বের করা থামগুলো নোনায় খাওয়া, একেবারেই দড় মনে হয় না। সিলিং অনেক উঁচু, পুরনো শালকাঠের তীরবরগা অনেক স্থানে খয়ে হড়কে খসে যেতে বসেছে, কিছু স্থলে ছাদ খসে পড়েছে। বুনো পায়রা, প্যাঁচা, বাদুড় নানা জায়গায় বাসা গেড়েছে ও মাঝে মাঝেই বিদঘুটে চিৎকার করে উঠছে। এখানে দাঁড়াশ সাপ ঘুড়ে বেড়ায়।

শগবত খাওয়া শেষ হলে খালি গেলাস টি-পয়ে রেখে দিয়ে খুড়ো বললেন, "এটা খেলে তো! এবার তোমার গায়ে সামান্য তাপ বাড়বে। মাথাটা ঝিকোবে। আমি মন্ত্র পড়ে দিয়েছি, কালী কটকা, হাওয়াই সটকা মন্তর। হিক্রু ডিক্রু গুরাচ খাঞ্জি পটিতাচ ঘ্রাউ, মিস্ত্রির গন্ধ পাও?"

"আজ্ঞে কিছুকিঞ্চিৎ পাই।"

"পট পটিতং পড়াচা, পাচকিসিতন খরচা, রং আর তুলি। এসো।"

"আজ্ঞে কোথা?"

আবিরমামার হাত ধরে একটা ভাঙা গুহার মতো জায়গায় টেনে আনলেন দিনু সিকদার। গুহার মুখে, আসলে ঘরের দেওয়াল খসে গিয়ে গুহাবৎ দেখায়, তার মুখে কালো পরদা ঝুলছে, তারই গায়ে আঁকা নরকঙ্কালের ভয়ঙ্কর ছবি, দেখেই রক্ত বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

"এর নাম দুম্বা পীর। ভূতের এরকম লেজ দেখেছ কখনও? উল্কা আকাশে ছিটিয়ে গেলে যেরকম ঝরা আগুনের স্রোত হয় ঝটিকার মতো, দুম্বার সেই রকম লেজ ছিল। ওইটে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উনি জিন তাড়াতেন, ভূতের চালচলন সিধে করতেন। মিশরের লাল দরিয়ার তীরে তাঁর ছিল বাবার নৌকা গুড়ার ব্যবসা। ব্যবসায় তার মন ছিল না।"

"তো, কীসব বলছেন আপনি খুড়ো? এখানে সেই পীর থাকতেন?"

"হ্যাঁ। এ ছিল সাহেবের হাওয়াখানা। ওই পীরকে উনি আশ্রয় দেন। এখন আমিই এখানে পীরের খিদমত করি, মানে সেবা করি। এই পটের নকশা তারই শিক্ষা, তার হাতে ছিল একটা লাঠি। জাদুলাঠি বলা যায়। এই গোটা চাকলা ছিল আমার ঠাকুরদার বাবার তিনপুরুষ আগের জমিজিরেত। সাহেবরা কেড়ে নিয়ে কুঠি বসায়। ঠাকুরদার পূর্বপুরুষরা এখনও আছেন। কঙকাল সরোবরের ধারে একটা মহল আছে, সেখানে।"

"কীভাবে আছেন তাঁরা?"

"কঙ্কাল হয়ে ঝুলে আছেন।"

"পীরের লাঠিটা?"

"তাও আছে। সুলেমানি ভাষা। ময়ূর মহল যখন তৈরি হচ্ছে, বাদশা একটা ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে লাঠিটা পিছনে প্যালা দিয়ে মানে ঠেকনো করে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন। রাতদিন যতক্ষণ কাজ চলত, উনি দাঁড়িয়ে থাকতেন। দুম্বা পীরের পূর্বপুরুষরা মিস্ত্রি ছিল। তারা কাজ করতে করতে মুখ তুলে বাদশাকে যে একবার চেয়ে দেখবে তাতেও ভয়। এতই কড়া বাদশা ছিলেন সুলেমান।"

"তারপর?"

"একদিন বাদশা কাজের তদারকি করতে করতে লাঠিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই মারা গেলেন, কেউ জানতেও পারল না। তখন বাদশার পোষা জিনেরা বাদশাকে ওইভাবে খাড়া করে রেখে দিল। লোকেরা বাদশা রয়েছেন দেখে হাত চালিয় রাতদিন কাজ করে মহল বানিয়ে ফেলল। দুম্বার বাবা হেড মিস্ত্রি। কাজ শেষে বাদশার সামনে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম দিলে। মিস্ত্রির হাতের সামান্য ধাক্কা লেগে গেল বাদশার পায়ে। বাদশা উল্টে পড়ে গেলেন। তখন দুম্বার বাবা বুঝলেন তারাও কেউ বেঁচে নেই, তারা সব ভূত হয়েগেছে।"

আবিরমামা বললেন, "আমার নেশা হয়েছে খুড়ো। জ্বর-জ্বর লাগছে। ফিটনের শব্দ পাচ্ছি। বাদশার লাঠিটা তাহলে দুম্বার বাপ....."

"হ্যাঁ গো! ওই লাঠি হাতে করে দুম্বা তখন মরুভূমির বুকে বিবাগী হয়ে পীরত্বের জন্য বের হয়ে চলে আসেন। জিনসিদ্ধ লাঠি। নীল সাহেব ভেবেছিলেন তারাও ওইভাবে চাষিদের উপর তদারকি করবে। মরে গিয়েও পাহারা দেবে। সেইজন্য কঙ্কাল লটকে রেখে গেছে।"

ধীরে ধীরে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো হয়ে পড়েন মামা আবিরলাল। কঙ্কাল সরোবরের পাড়ে এসে দাঁড়ালেন মামা আর দিনুখুড়ো। সরোবরে অনেক রকম ফুল ফুটেছে। নানা তার রং। সাদা ফুলগুলো হিরের মতো জ্বলছে।

হঠাৎ জল তোলপাড় করে ভেসে উঠল কয়েকটি কঙ্কাল। তারপর তারা জলের উপর অনেকখানি খাড়া হয়ে উঠে নাচতে শুরু করল। এরা কি সব মিস্ত্রি?

"নাচে কারা খুড়ো?"

"কই, কারা নাচে বাবা?"

"আমি যে দেখছি।"

"নেশা হয়েছে আবির। খুয়াব-এ-দুম্বা পাচক খেয়েছ, হাতেনাতে ফল পাচ্ছ। ভূত তো কেউ বিশ্বাসর করে না, প্যাঁচে পড়লে করে। আর কী দ্যাখো হে?"

কত কী যে দেখতে পাচ্ছিলেন মামা। ভূতের পট বারবার চোখের সামনে ভেসে ভেসে উঠছিল। একটা রাজভূতের নাম ভারত-ভূশণ্ডী জননাবন, আর একটা উপজাতি ধরনের ভূতের নাম কিমাশ্চর্য পারস্যের চাকমা, ছোট রাজ্যের নাম কিমাগড়। সেই কিমাগড়ের ভূতের জমিদার গরুচড়ানন্দ পটপটেশ্বর, তাঁর বংশলতিকায় নিম্নস্থানে রয়েছে মির্জা আয়কম বায়কম ক্ষতিবুদ্দিন গাড়োয়াল। সত্যি সেলুকাস! কী বিচিত্র এই কুঠিয়ালি ভূতের দেশ!

একটা দেওয়ার গাছের দিকে মামার চোখ চলে যায় সহসা। সরোবরের নাচ থেমেছে, আশ্চর্য পূর্ণিমায় মৃতেরা কি এইভাবে জেগে ওঠে? দেওদারের মাথার উপর গোল চাঁদ ফটফট করে হেসেই আকুল। গাছের নীচে ঘাসের জমিতে অত্যন্ত ফরসা একটি মেয়ে বসে দাঁত দিয়ে ঘাস কাটেছে। অপূর্ব তার রূপ। ও কারো দিকে চাইছে না, আকাশ পারে চেয়ে আছে। ওর চোখ দিয়ে গলে পড়ছে নিঃশব্দ কান্নার জল। কেন কাঁদছে ওই সুন্দরী? ওখানেই বা ওইভাবে বসে আছে কেন? ও কি পরী? ও কি মানুষ নয়? ওর ডানা কোথায়? ও কি কারও জন্য প্রতীক্ষা করছে? তবে কি সে কোনও রাজকন্যা?

খুড়ো আবিরমামার একটা হাত চেপে ধরে ছড়া কাটলেন : দোল দোল দুলুনি/ভূতের মাথায় চিরুনি।

অবাক হয়ে দেখলাম, মেয়েটির মাথার চুলে একখানা চিরুনি গোঁজা। মামা এইভাবে বলেছিলেন আমাদের। ওঁর মনে হয়েছিল, এমন সুন্দর মেয়ে কি কখনও ভূত হয়?

খুব সাহস করে দেওদার তলায় এগিয়ে গিয়ে মামা দেখলেন কোনও মেয়ে নয়, ছায়ামেশানো খানিকটা জ্যোৎস্না, আর কিছু নেই। মামা এবারক যথেষ্ট ভয় পেয়ে গেলেন। জ্যোৎস্না তাহলে নিজেই কখনও কখনও সুন্দরী মেয়ে সেজে বসে থাকে। পরী হয়, যদিও মাথায় গোঁজা থাকে ভূতের চিরুনি।

দিনুখুড়ো অতঃপর মামাকে একটা অন্ধকার মহলে ঢুকিয়ে দিলেন। ঘরে ঢুকেই অদ্ভুত দীর্ঘশ্বাস শুনতে পান মামা। হাড়ে হাড়ে ঘা লেগে কেমন শব্দ হচ্ছে। কারা যেন কথা বলতে চাইছে। অথচ শব্দ ফুটে বের হচ্ছে না, ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। মামার হাতে লাগল হাড়ের মতো শক্ত ধাঁচা একটি। বুঝতে পারলেন শূন্যে ভাসছে মানুষের কঙ্কাল কয়েকটি। কী দিয়ে টাঙানো আছে অন্ধকারে বোঝা যায় না। ওই ওপারে ঘুলঘুলি দিয়ে সামান্য জ্যোৎস্নার আভা আসে, তাতে কঙ্কালগুলোকে আরও ভয়াবহ মনে হয়।

ফিসফিস করে উঠল কারা? কানের ওপর শ্বাস ফেলল কে? হি হি করে হাসছে একজন। কোনও একটা অদৃশ্য ফোকর বা গবাক্ষ দিয়ে খুব হাওয়া আসছে মনে হয়। কে যেন বলল, "আমরা সব খেটে খাওয়া মানুষ বাবা! আমার নাম তোরাপ। নাটকের লোক। দীনবন্ধুবাবুর নাটক। মনে নেই? এখানে চাষিবউ খুব নাদান হয়, কাঁদে গো!"

আবিরলাল কঙ্কাল ঠেলে ঠেলে ঘরের মধ্যে পাগলের মতো ঘুরতে লাগলেন। বাইরে দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করছেন দিনুখুড়ো। কাকে যেন আয় আয় করে ডাকছেন। মনে পড়ে গেল গো-জিনের কঙ্কাল ভক্ষণ করতে আসার কথা।

কঙ্কাল ঠেলতে ঠেলতে ঘেমে উঠছিলেন মামা। গায়ে এসে আছড়ে পড়ছিল তারা, কপালে লেগে ঝনঝন করে উঠছিল। হঠাৎ চড়া গম্ভীর গলায় কে যেন বলল, "স্কাউন্ড্রেল! পুওর কালটিভেটর। হামি টুমার কলিজা খাবে। হামার দণ্ড দিয়া প্রহার করবে, কিল করবে।"

অনেক কষ্টে কঙ্কাল মহল থেকে বের হয়ে আসেন মামা। বাঁশবাগানে ছায়া আর জ্যোৎস্নায় মাখামাখি, কী একটা জীব ওখানে ঘুরছে। কালো তার রং। তাকেই বোধহয় ডেকে চলেছেন দিনু সিকদার। মামা বাইরে এসে সিঁড়ির ওপর বসে

পড়লেন। ক্লান্তিতে আর ভয়ে হাঁফ নিতে নিতে হঠাৎ মহলটার বাইরের একটা থামে পেতলের চাকতির ওপর চোখ পড়ে তাঁর। থামের গায়ে সাঁটা। উঠে গিয়ে মামা দেখলেন চাঁদের স্পষ্ট আলোয় লেখা রয়েছে, ইংরেদিতে, 'সায়েন্স ল্যাব'। তারপর সাহেবের নাম লেখা। ও তাহলে ল্যাবরেটরি, কঙ্কাল থাকবে না কেন!

এতক্ষণ তাহলে কীসব কথা শুনলেন আবিরলাল? তাঁর আশ্চর্য লাগছিল ই আর কি অর্থাৎ ইয়ার্কি, মুই আর কি — ফট, ফটকা, হাওয়াই সটকা দিনু সিকদারের কাণ্ড দেখে! দিনু পট লেখে। ভূতের ছবি আঁকে নানা কথায় বানিয়ে বানিয়ে অবাক ভয়ঙ্কর কুঠিয়ালির প্রেতরাজ্য গড়েছেন।

বাঁশবনে হাড় খাচ্ছে পশুটা। ভয়ই করছিল মামার। এখানে ভাগজোত করতে সত্যিই কোন চাষি সাহস করে আসবে না। এ শুধুই দিনুখুড়োর ভাগজোতের জায়গা। তিনি ভূতের ভয় দেখিয়ে অন্য চাষিদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন, একা ভোগ করছেন শেঠের চৌধুরিদের কুঠির সম্পত্তি। দিনুর অবস্থা কিন্তু সম্পন্ন।

বাঁশবনের দিকে সাহস করে এগিয়ে চললেন মামা আবিরলাল। ছায়া আর জ্যোৎস্নায় সে এক বিচিত্র সমাবেশ। মটমট শব্দ করছে বাঁশের গ্রন্থি, মনে হচ্ছে তারা বাতাসের মুখ গহ্বরে হাড় চিবিয়ে চলেছে।

বাঁশের ঠোঙা আর মরা পাতায় পা পিছলে যেতে চায়। এক একটা মানুষ থাকে হাঁটাচলার সময়ও যাদের হাড় মটমট করে, দিনু সেই রকম মানুষ।

মামার পিছনে মটমট করে ছুটে আসেন খুড়ো। তাঁর দেহের গ্রন্থি কি আলগা? এই বয়সেও খুব খাটিয়ে লোক, লাঙল চালাতে পারেন, মই চড়ে কোমর সিধে করে দাঁড়াতে চান জমির ওপর।

খুড়ো বললেন, "মানুষের হাড়ের চিরুনি কখনও দেখেছ আবিরলাল? দেওদার গাছের তলায় পড়েছিল। নাও, হাতে নিয়ে দ্যাখো।"

কী আশ্চর্য! সব বুঝেও মামা হাত বাড়াতে গিয়ে কেমন সাহস হারিয়ে ফেললেন। তখন দিনু পাহারদার উঁচু স্বরে হো হো করে হেসে ফেললেন। তার দাঁতগুলো কি নকল? এত বয়সে দাঁত থাকার কথা নয়। মনে হল তিনি একটা ভূতের মতো হেসে চলেছেন।

কালো জীবটা মাটি শুঁকে শুঁকে কি যেন খুঁজছে। আরে এ টো ভাগাড়। হাড় খুঁজছে নির্ঘাত। ওটা তাহলে কি ধরনের প্রাণী?

খুড়ো বললেন, "লোম আছে। কাছে এলে মানুষের হাড়ের চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে দিই বাবা। আনন্দ পায়।"

আর সাহস হল না মামার। এখানে সব কেমন উলটোপালটা হয়ে গেছে। গো-জিনের গায়ের লোম আঁচড়ে দেওয়া হয় মানুষের হাড়ের চিরুনি দিয়ে, ভাবলেই গা কাঁটা দিয়ে ওঠে।

পশুটা নিশ্চয়ই খুব ভীরু। কাছে আসতে চাইছে না। মামা একটা দুর্বোধ্য চিৎকার করে উঠলেন। সেই শব্দে গো-জিন পালাতে পালাতে ভেউ করে কেঁদে উঠল। মামা ওকে তাড়া করে ছুটতে লাগলেন।

মামা বসেছিলেন দক্ষিণ কলকাতার এক বন্ধুর বাড়ির ফ্ল্যাটে। বন্ধুর পত্নী একজন বন আমলা। তাঁর বাড়ির গ্যারেজের পাশ দিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে দেওয়ালে প্লেটে সুন্দর করে ইংরাজিতে লেখা, 'কুকুর হইতে সাবধান'।

কুঠির কুকুরটা ছিল পথের কুকুর। খিদের জ্বালায় ওই ভাগাড়ে পুরনো হাড় খুঁজে খেতে এসেছিল তেড়ে ধরতে না পারলেও মামা ছুটতে ছুটতে একসময় বুঝতে পেরে ছিলেন ওটা নিতান্তই ক্ষুধার্ত শীর্ন কুকুর, রোগা, অসহায়। পথে পথে তার জীবন কেটে যায়।

কলকাতার বন্ধু থাকেন প্রকাণ্ড উচ্চ সৌধে। এতবড় ফ্ল্যাট, তার চারিদিক শোভাময়, দেওয়ালে লক্ষ টাকার চিতর টাঙানো। একটি ভয়ঙ্কর হিংস্র কুকুরকে সঙ্গে করে এসে দেখাদিলেন মিসেস ঝাঁ। তাঁর বাংলা উচ্চারণে কেমন ইংরেজির মতো গন্ধ মাখানো, শ্বাসাঘাতে ইংরেজির মতো জড়িমা। কুকুরটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে একটি স্ফটিক শুভ্র পাথরের দামি প্লেটে ভর্তি করা সাদা শাঁক আলুর খাবার এগিয়ে দিলেন। কলকাতার বুকে তিনি বস্তি উঠিয়ে দিয়ে ইমারত তৈরির ব্যবসা করেন। প্রমোটার।

মামার বন্ধু হওয়ার কথা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে পড়েছেন। সামান্য একটা কথা জেনে নেওয়ার জন্য এসেছেন

মামা। কিন্তু লোকটা যে এত ধনী তা তিনি জানতেন না। স্ত্রী বাঁ হাতে চিরুনি ধরে মাথার চুল আঁচড়ে নিতে নিতে অকারনে হেসে মামাকে দৃষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। নিজের চুল আঁচড়ে নিয়ে কুকুরকে থাওয়াতে খাওয়াতে হঠাৎ সেই চিরুনি কুকুরের বলিষ্ঠ গায়ে লোমের ভিতর চালাতে চালাতে কথা বললেন, "আপনার নাম?"

কুকুরটার দেহ কেমন পুলকিত হয়ে উঠল। চোখ তুলে মামার চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল কুকুরটা। প্রাণীটার লেজ আগুনের ঝাঁটার মতো লেলিহান। মামা আশ্চর্য্য ভয় পেয়ে লক্ষ্য করলেন, এ নির্ঘাৎ গো-ভূত। হাড় খায়।

ছবি কুইজ

ওপরের ছবিটি আমাদের এক ছোট্ট বন্ধু আমাদের দপ্তরে পাঠিয়েছে। সেই ছবিটার হুবহু নকল করে আমি নীচের ছবিটি করেছি। সম্পাদক মশাইয়ের কাছে নিয়ে যেতেই তিনি বললেন দুটোর মধ্যে প্রচুর অমিল, আমি তো বুঝতে পারছি না - তোমরা দেখ তো পারো কি না। অন্তত দশটি অমিল নাকি আছে। না পারলে ৫৫ পাতা দেখে নাও।

তুমি কি স্মার্ট ?

তুমি কি নিজেকে স্মার্ট মনে কর? তাহলে নিজেই পরীক্ষা করে তা দেখে নিতে পারো। তোমাকে শুধু নীচের সব প্রশ্নগুলোর ঠিক ঠিক উত্তর দিতে হবে। যদি সব প্রশ্নের উত্তর সঠিক হয় হয় তাহলে সত্যি, তুমি স্মার্ট। আর যদি উত্তরগুলো সব ঠিক নাও হয় তাহলেও চিন্তার কিছু নেই — একটু অভ্যাস করলেই হয়ে যাবে।

১। যদি ১২৩-এর অর্থ হয় কটক, তাহলে ৩২১ এর অর্থ কী?

২। 'গপুরভাল' — এই শব্দটির মধ্যে বিহারের একটি শহরের নাম লুকিয়ে আছে। খুঁজে বের কর।

৩। একটি বাসস্টপে একজন ভদ্রলোক ও একজন ভদ্রমহিলা বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। ভদ্রলোক পূর্ব দিকে মুখ করে ও ভদ্রমহিলা পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। দু'জনে দু'জনের বিপরীত দিকে যাবেন। যে দিকে মুখ করে এঁরা দাঁড়িয়ে আছেন, সেই অবস্থাতেই মুখ না ঘুরিয়ে একে অপরকে কীভাবে দেখতে পাবেন?

৪। মানুষের জীবনে গড়ে বা অ্যাভারেজে কতগুলো জন্মদিন হতে পারে?

৫। কোনটা ঠিক?

ক) ৮ ও ৮ মিলে ১৫ হয়।

খ) ৮ ও ৮ যোগ করলে ১৫ হয়।

৬। যদি ৩টি আমের মধ্যে দুটি আম নাও তাহলে তোমার কটা আম রইল?

ছড়া ও কবিতা

তা ধিন ধিন

জিয়াদ আলী

ডাবের চেয়ে পেপসি শ্রেয়!
আমের চেয়ে ম্যাঙ্গো জুস
কৃত্রিমতায় ভরেছে দেশ
ভারতবাসী বেজায় খুস।

চাষী মজুর মরছে ধুকে
ধূম পড়েছে — বিশ্বায়ন
বড়োলোকের পোয়া বারো
আটমোড়লের সাতকাহন

মাসির কাছে মামার বাড়ির
গপপো এখন জমজমাট
দিন গিয়েছে ঝাঁটার এখন
যন্ত্র দেবে উঠোন ঝাঁট।

হাত-পা-ওয়ালা মানুষগুলো
দেশশুদ্ধ কর্মহীন
গরিব মরে পেটের জ্বালায়
বাবুর ঘরে তা ধিন ধিন।

বাবা-মা

প্রমোদ বসু

বাবা যদি ফের ছোট হয়ে যান,
শিশু হয়ে যান মা,
কে তবে রোজ ধরবেন কান,
মোছাবেন কান্না?

কে তবে শাসনে, আদরে তখন
ঘিরে থাকবেন, ভাবি।
বাবা-মাই জানি হাতে তুলে দেন
স্বপ্নলোকের চাবি।

কেঁচে-গণ্ডূ

পঙ্কজ সাহা

পিপ ফেলেছে ছিপ
পেন্নাম দিই টিপ!
কেন রে তোর বকরবকর
রোদ খেলছে চকরবকর,
এখন একটু চুপ
পিঠে পড়বে — ধুপ
নইলে মারবে ডাণ্ডা
গুণ্ডা এবং শণ্ডা!

কী উঠলো ছিপে
মাছ না মাছের মুণ্ডু
আস্ত কেঁচেগণ্ডূ!

মিঠে কড়া মজার ছড়া

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

(এক)
দোকানিকে রেগে বললেন ক্রেতা
"হাতির দাঁতের গয়না,
কাল যেটা নিয়ে গেছি, তা' নকল
এমন তো কভু হয় না!"

দোকানি বললে, ছি-ছি সে কি কথা;
সামলাবো কত ধকল?
আমরা কি করি, হাতিরাও যদি
পরে দাদা দাঁত নকল!!

(দুই)
প্যালা বলে, ফের শুনি যদি তোর
মুখে বড়-বড় 'বাত',
সত্যি বলছি ঘুঁষি মেরে ঠিক
খুলে নেবো সব দাঁত!

ফ্যালা বলে, তুই দাঁড়া রাগ ভুলে
ঘুঁষি-টুসি রাখ্ তুলে,
এই নে দু'পাটি দাঁত আমি তোকে
নিজেই দিচ্ছি খুলে!!

(তিন)
ষষ্ঠী সেনের কোষ্ঠি দেখেই
বললে জ্যোতিষ-গণৎকার,
পরলে 'রত্ন' নীরোগ হবি
সারবে ব্যাধি চমৎকার

হাঁফায় জ্যোতিষ, ষষ্ঠী বলে,
খাবেন নাকি চা-পানি?
'রত্ন' পরেই থামান আগে
নিজের কঠিন হাঁপানি!!

(চার)
সতীশ সাহার হাতটা দেখেই
বললে জ্যোতিষ অষ্ট রায়,
তোর তো দেখি বছর-দশেক
চলবে ভীষণ কষ্ট হায়!

তারপরে কি ঘুচবে কষ্ট?
বললে রেগেই সতীশ জোর,
বললে জ্যোতিষ, দশ-বছরেই
স'য়ে যাবে সব কষ্ট তোর!!

যুদ্ধবাজ শান্তিরাজ

ভবেশ দাশ

যুদ্ধ যারা করছে করুক
তোমার আমার কাজ কী?
কাজের কথা শুনলে তোমার
মাথায় পড়বে বাজ কি?
ফুল তো ঠিকই উঠছে ফুটে
তার কাজে তো নেই ফাঁকি
আমার কাজটা ফেলে আমি
চুপটি কেন বসে থাকি?

যুদ্ধবাজরা যুদ্ধ করে
ওটাই ওদের কাজ তো,
আমরা যারা শান্তিপ্রিয়
যুদ্ধে যাওয়া সাজ তো?

তাই বলে কি চুপটি করেই
ঘরের কোনে থাকবো?
জীবনটাকে ধন্য করার
যুদ্ধে কখন জাগবো?

করছে ওরা মারণ-যুদ্ধ
মরছে মানুষ দুইবেলা,
ফুল ফোটানোর দায় নেই তাই
আকাশ থেকে বোম ফেলা।

আমরা যারা শান্তিপ্রিয়
ফুলের কাছে শিখতে চাই
বারুদঠাসা এমন দিনে
এসো, আরও ফুল ফোটাই।

ফুলের গন্ধে মাতাল হবে
মূর্ছা যাবে যুদ্ধবাজ
ফুলের গন্ধে আসবে ফিরে
বারুদ বিহীন শান্তিরাজ।

তিন সত্যি

অগ্নি বসু

হৈ রে বাবুই হৈ
কথা কার সাথে যে কৈ
সবাই শুধু শুধোয় এসে
"কোন দলে রে তুই?"
কোন পথে যে পা রাখবো,
বুঝছি না কিছুই।

(দুই)
আগডুম বাগডুম
দেখো কাজের কী বা ধুম!
গর্ত দিয়ে গড়ায় গাড়ি,
জ্যান্ত মানুষ গুম।
অষ্টপ্রহর আঁতকে আছে
দু'চোখে নেই ঘুম।

(তিন)
ও এলাটিং সইলো,
মনের কথা কইলো,
রাজনীতিতে বসবে ভিয়েন
তাই এসেছে তৈল।
আমার কেন ডাক পড়ে নি
আমি কি কেউ নই লো!

ভারতবর্ষ

রাসবিহারী দত্ত

তিনকুলে তার নেই কো কেউ
থুত্থুড়েএক বুড়ির
একলা একা রাস্তা হাঁটে
চিমসানো চিমকুড়ি

বকবকিয়ে রাস্তা পেরোয়
কার উপরে রাগ?
বলতে গেলেই তাড়া করে
ভাগ্ ব্যাটারা ভাগ্।

মজা পেয়ে ছেলেরা সব
ভেংচি কাটে, খ্যাপায়
বকবকানি ওমনি বাড়ে
উঁচিয়ে লাঠি দাপায়।

আটকুনোদের আবাগি সব
নিঃবংশে যাবি
অলপ্পেয়ে চিমসে চিকুড়
সংসারটাই খাবি।

তিনকুলে তার নেই কো কেউ
থুত্থুড়ে এক বুড়ির
একলা একা রাস্তা হাঁটে
চিমসানো চিমকুড়ি।।

রংলাপ

তমাল লাহা

ঠিকানা কোথায়? — ঘোড়ার ডিম
কাজ কারবার ? — অতঃকিম
ঘুমোও কেমন? — নাছোড়বান্দা
চারপাশেতে? — ফাঁসির ফান্দা
জল বায়ু সব ? — আঁশ কপ্পুর
কোন দল চাস? — যা রোদ্দুর
পড়াশোনা, স্কুল ? — আই. এ-বাই. এ ডট
রুজি রোজগার ? — ফোকটিয়া পোট
স্বপ্ন টপ্ন ? — সূর্যটা লাল
দুঃখ টুঃখ? — বেওয়ারিশ খাল
বড় জিদে তোর, উত্তর দে — ডান কান ছুঁয়ে দক্ষিণ নে
ভালবাসা নিবি ?— ন্যাকা কার্তুক
ভাড়ারের চাবি? — সব, মিথ্যুক।

মেঘ

শ্যামল জানা

মেঘের বাড়ি কোথায় তুমি জানো?
উত্তরে নয় দক্ষিণে লটকানো?

এ মেঘটার চাঁদের পাশে বাড়ি
ঐ মেঘটা বৃষ্টি লেখে রোজ
এই পাড়াতে মেঘের সারিসারি
দু-একটাকে জোছ্নায় পাবে খোঁজ।

কালচে মেঘের ছোট্ট একটা ভুলে
বৃষ্টি পড়ে গরীব বিছানায়
ভালো মেঘটা নিজের ছাতা খুলে
বৃষ্টি ঢেকে দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়।।

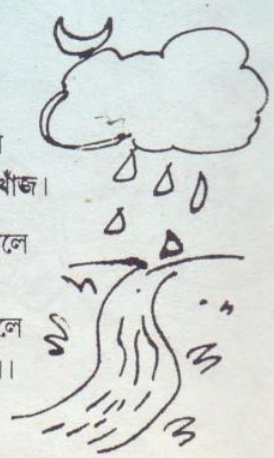

বীরবল বা গোপাল ভাঁড়ের গল্পে যেমন মজা ও বুদ্ধির ছোঁয়া রয়েছে তেমনি আরেক বিশ্ব বিখ্যাত চরিত্র 'আফেন্দী'র গল্পে রয়েছে বুদ্ধিমত্তা ও হাস্যরসের আশ্চর্য উপকরণ। 'আফেন্দীর' নানা কাহিনী সারা বিশ্বে আজও দারুণ জনপ্রিয়।

বস্তার মধ্যে বুদ্ধি

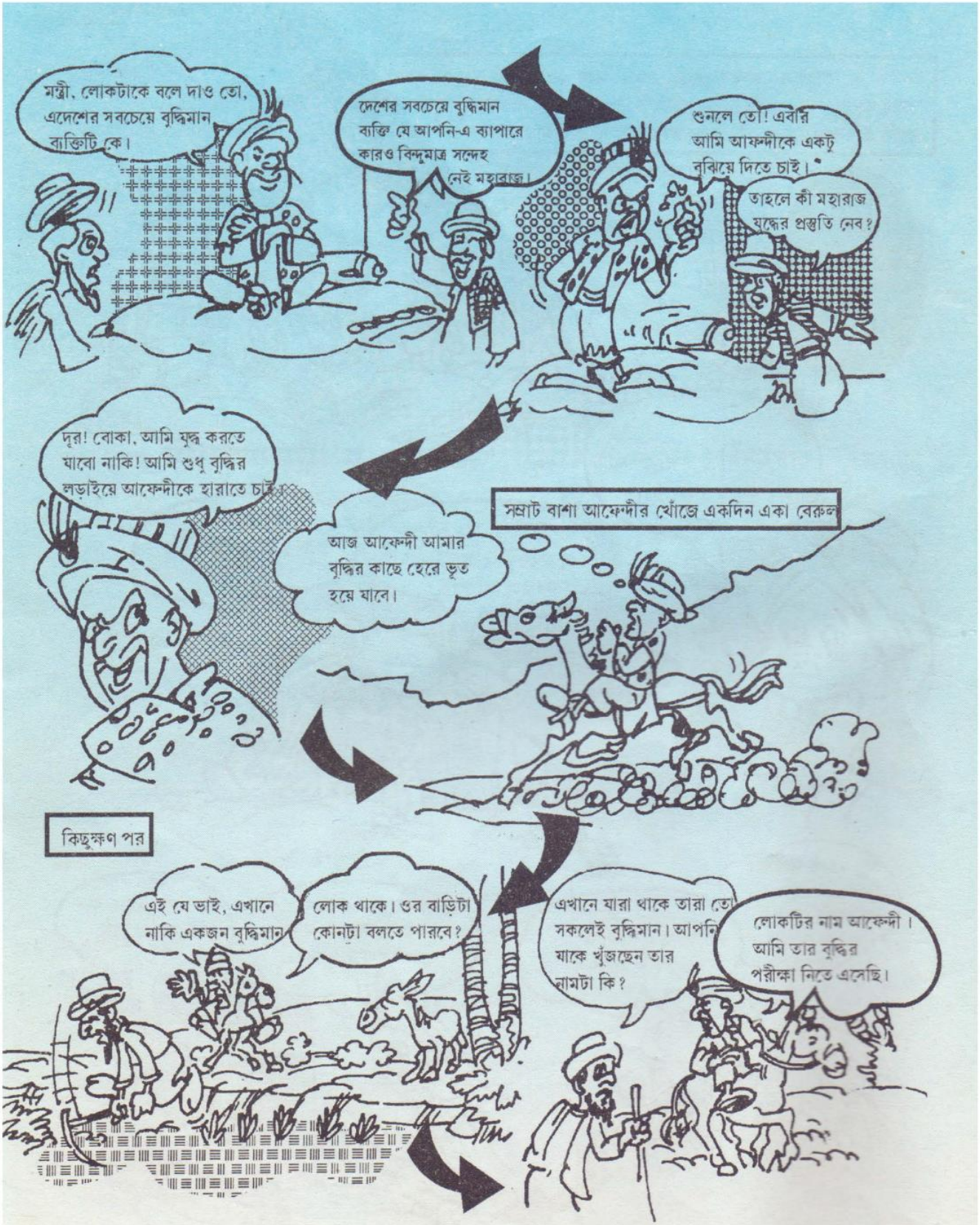
মন্ত্রী, লোকটাকে বলে দাও তো, এদেশের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তিটি কে।
দেশের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে আপনি-এ ব্যাপারে কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই মহারাজ।
শুনলে তো! এবারি আমি আফন্দীকে একটু বুঝিয়ে দিতে চাই।
তাহলে কী মহারাজ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেব?
দূর! বোকা, আমি যুদ্ধ করতে যাবো নাকি! আমি শুধু বুদ্ধির লড়াইয়ে আফেন্দীকে হারাতে চাই।
সম্রাট বাশা আফেন্দীর খোঁজে একদিন একা বেরুল
আজ আফেন্দী আমার বুদ্ধির কাছে হেরে ভূত হয়ে যাবে।
কিছুক্ষণ পর
এই যে ভাই, এখানে নাকি একজন বুদ্ধিমান লোক থাকে। ওর বাড়িটা কোনটা বলতে পারবে?
এখানে যারা থাকে তারা তো সকলেই বুদ্ধিমান। আপনি যাকে খুঁজছেন তার নামটা কি?
লোকটির নাম আফেন্দী। আমি তার বুদ্ধির পরীক্ষা নিতে এসেছি।

আমার নামই আফেন্দী।
ওঃ তাহলে তুমি সেই ব্যক্তি! আমি এদেশের সম্রাট। তুমি কি আমাকে বোকা বানাতে পারবে? চেষ্টা করে দেখো তো?
ওঃ এই ব্যাপার। এজন্য আপনি কষ্ট করে এখানে এলেন কেন মহারাজ। আমাকেই রাজপ্রাসাদে ডেকে পাঠাতেন।
ছাড়ো ওসব কথা। এখন তুমি আমাকে বোকা বানাও তো দেখি।
এক্ষুণি? তাহলে অমাকে ক্ষমা করুন মহারাজ। আমার সাথে তো এখন বুদ্ধিগুলো নেই। বাড়িতে ওগুলো বস্তাবন্দী করে রেখে এসেছি।
আপনি যদি একটু অপেক্ষা করেন তাহলে না হয় আমি ওগুলো বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে পারি।
ঠিক আছে, তাই হবে।
যদি আপনার ঘোড়াটা দেন তাহলে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে ঘুরে আসতে পারবো।
ঠিক আছে আমার ঘোড়াটা তুমি নিয়ে যাও।

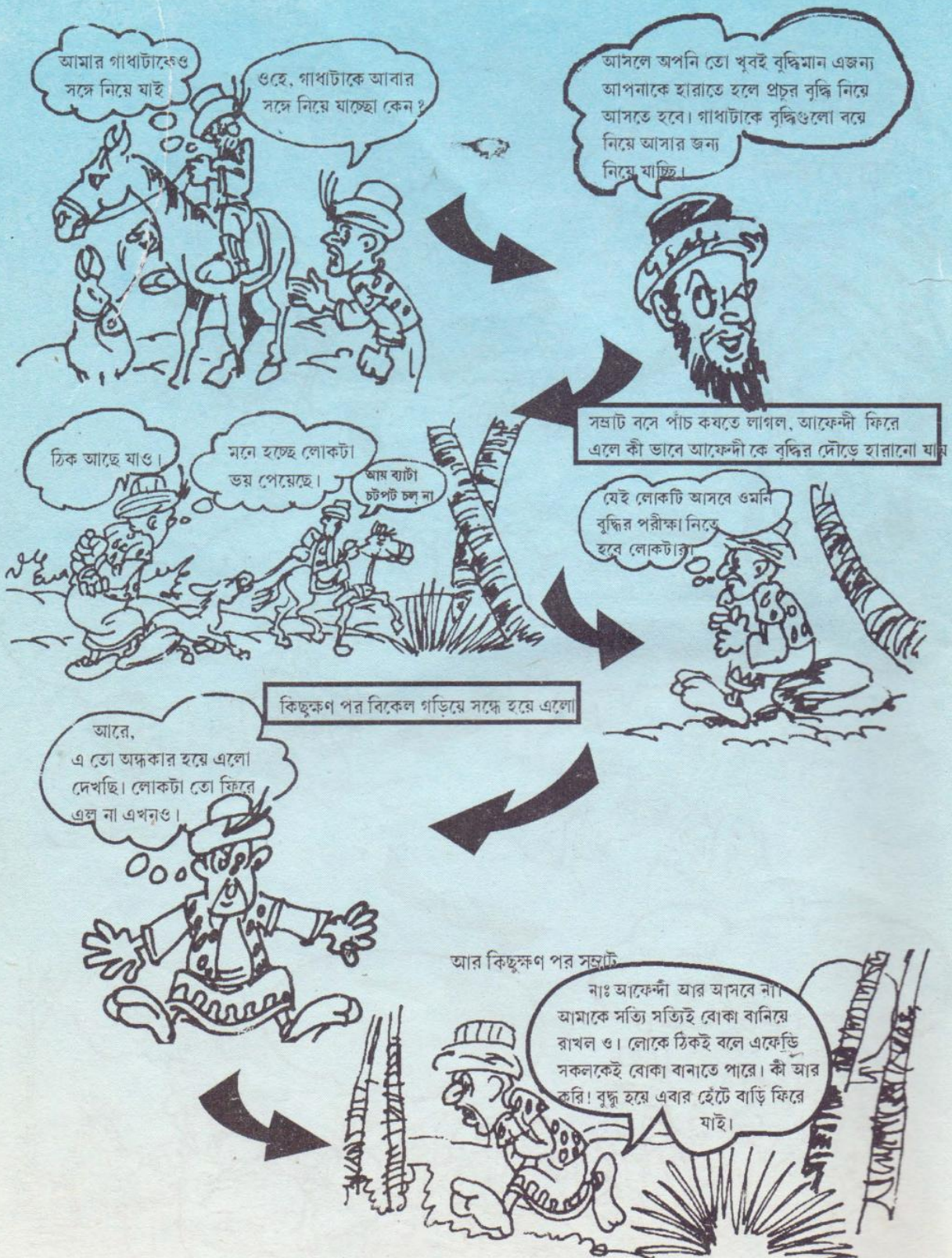
আমার গাধাটাকেও সঙ্গে নিয়ে যাই
ওহে, গাধাটাকে আবার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছো কেন?
আসলে অপনি তো খুবই বুদ্ধিমান এজন্য আপনাকে হারাতে হলে প্রচুর বুদ্ধি নিয়ে আসতে হবে। গাধাটাকে বুদ্ধিগুলো বয়ে নিয়ে আসার জন্য নিয়ে যাচ্ছি।
সম্রাট বসে পাঁচ কষতে লাগল, আফেন্দী ফিরে এলে কী ভাবে আফেন্দী কে বুদ্ধির দৌড়ে হারানো যায়।
ঠিক আছে যাও।
মনে হচ্ছে লোকটা ভয় পেয়েছে।
আয় ব্যাটা চটপট চল্ না
যেই লোকটি আসবে ওনার বুদ্ধির পরীক্ষা নিতে হবে লোকটার।
কিছুক্ষণ পর বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে এলো
আরে, এ তো অন্ধকার হয়ে এলো দেখছি। লোকটা তো ফিরে এল না এখনও।
আর কিছুক্ষণ পর সম্রাট
নাঃ আফেন্দী আর আসবে না। আমাকে সত্যি সত্যিই বোকা বানিয়ে রাখল ও। লোকে ঠিকই বলে এফেন্ডি সকলকেই বোকা বানাতে পারে। কী আর করি! বুদ্ধু হয়ে এবার হেঁটে বাড়ি ফিরে যাই।

আই. কিউ . টেস্ট

■ যদি ৯-১০ টি উত্তর সঠিক হয় তাহলে আই. কিউ. *অসাধারণ।*

■ যদি ৬-৮ টি উত্তর সঠিক হয় তাহলে আই. কিউ. *বেশ ভাল।*

■ যদি ৩-৫ টি উত্তর সঠিক হয় তাহলে আই. কিউ. *ভাল।*

■ যদি সঠিক উত্তর ৩ এর কম হয় তাহলে আই. কিউ. *সাধারণ।*

? বন্ধনীর মধ্যে শূন্যস্থানটি সঠিক সংখ্যা দিয়ে পূরণ কর ঃ—
২৩৪(৩৩৩)৫৬৭, ৩৪৫( )৬৭৮

? নীচের সংখ্যাগুলির মধ্যে একটি সংখ্যা রয়েছে যেটি এখানে বেমানান। সংখ্যাটি বের কর।
১৬, ২৪, ৪৮, ৩০, ৯৬, ৩২, ৪০

? ANAIMOR শব্দটি থেকে একটি দেশের নাম খুঁজে বের কর।

? জাপানের রাজধানীর নাম কি?

? বেমানান শব্দটি খুঁজে বার কর—
কলকাতা, ভুবনেশ্বর, পাটনা, দিল্লী, নেপাল

? শুন্যস্থান পূরণ কর—
২ ৪ ৮ — ৩২ ৬৪

? একজন ডাক্তার তার ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছেন, ছেলেটি কে জিগ্গেস করাতে ডাক্তার বলছে ছেলেটি ওর ছেলে অথচ ছেলেটি বলছে ডাক্তারটি ওর বাবা নয়। ব্যাপারটা কী?

? ঠিকমতো সাজিয়ে গাছেদের নাম খুঁজে বের কর—
ক) শপলা খ) মূশিল গ) বরুদেদা

? অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন বোঝাতে সঠিক শব্দটিতে টিক দাও—
সাক্ষর/স্বাক্ষর

? নীচের বাক্যটির মধ্যে কী ভুল আছে?
আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোডটি মহাত্মাগন্ধী রোড থেকে দীর্ঘতম।

উত্তর ৫৫ পৃষ্ঠায়

পেটুক

ঋতর্ষি দত্ত
চতুর্থ শ্রেনী
কিশোর ভারতী স্কুল

ঘোষবাবুর বড় ছেলে
বড়ই পেটুক লোক
খাবার শেষে তার যে চাই
নেসকাফে আর
কোক।
জলখাবারে চাই-ই তার
একটি ডজন ডিম
বাড়তি ভুঁড়ি নিয়ে হাঁটেন
হাইফাঁই হিমসিম।

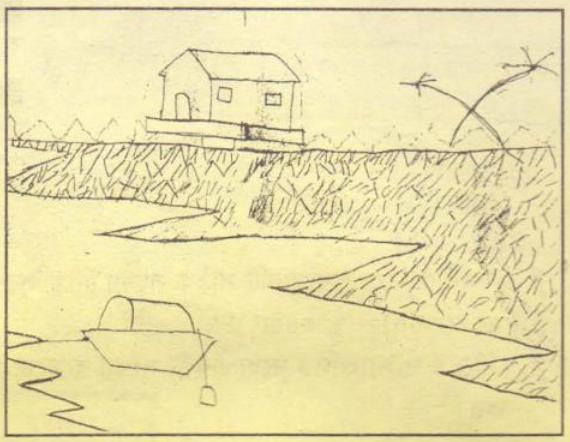

অগ্নিদীপা দাস (৫) - শ্রীমানী বাজার, কলকাতা

লিকলিকে ভীমসেন

পৃথা চক্রবর্তী(১২)

টিনটিন লিকলিকে
নামে ভারি ভাই,
তিনমণ চাল টানে
ভোর হলে তাই।
টপাটপ আশিখানা
কলা যদি পায়,
জল দিয়ে ছোলা ছাতু
খেয়ে ছুটে যায়।
নাম তার ভীমসেন
ঘুম ভালবাসে,
চোখ বুজে শুয়ে থাকে
যেন বুঝি হাসে।

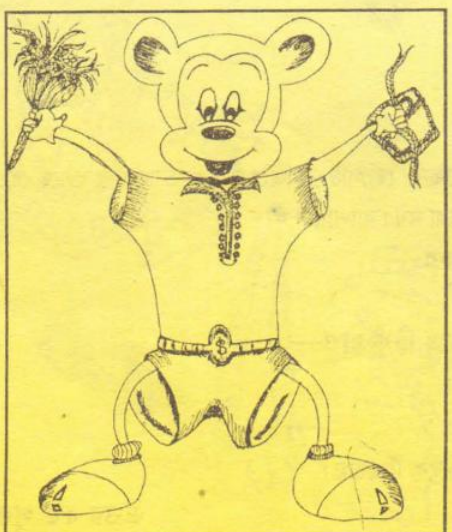

তনুজ দত্ত, শ্রেনী - চতুর্থ, স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুল

মাদার টেরেসা

সাগ্নিক চট্টোপাধ্যায়(১৪)
বিধাননগর গভঃ স্কুল
নবম শ্রেনী

কলকাতারই জননী মাগো,
তোমায় ভালোবাসি
দীন-দুঃখীর মুখে তুমি,
ফুটিয়েছিলে হাসি।
মাদার - তুমি মাদার!
বিশ্বমাতা তুমিই মা গো,
স্নিগ্ধ রসের আধার,
অনাথ শিশু, আর্ত মানুষ,
তোমার কোমল ছোঁয়ায় —
প্রাণ ফিরে পায়, তাই তো দেখি —
জগৎ মাথা নোয়ায়—
তোমার পায়ের কাছে।
কে আর বলো আছে?
সইবে তোমার মত।
জগৎ জোড়া মানুষগুলোর —
দুঃখ শত-শত।
আবার যদি আসো ফিরে
এই শহরেই এসো।
এমনি করেই আবার তুমি,
দীনকে ভালোবেসো।

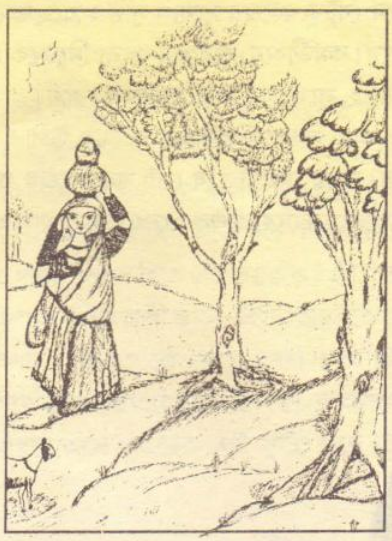

ইন্সিতা দে, শ্রেনী - নবম, হরিসভা গালর্স স্কুল

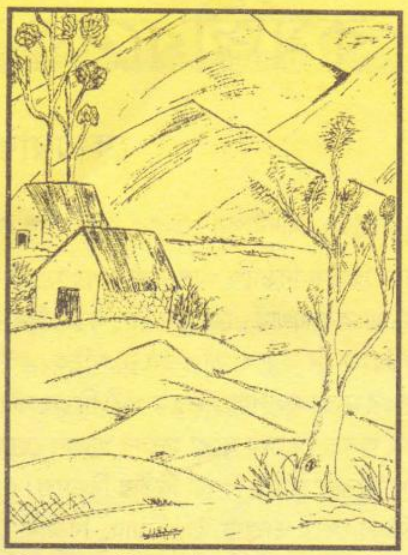

প্রীতি দে, শ্রেনী - ষষ্ঠ, হরিসভা গালর্স স্কুল

বর্ষার দিন

সায়ন্তনী সেন(১০)
লেকটাউন গভঃস্প
ষষ্ঠ শ্রেনী

রিমঝিম রিমঝিম
পড়ছে যে বৃষ্টি,
হায় হায় হায় হায়!
একি অনাসৃষ্টি।

রাস্তা ভরেছে কাদায়
পিছল হয়েছে ঘাট।
রাস্তায় কেউ নেই
বসেনি আজকে হাট।

আকাশে ঘন মেঘ
ময়ূর জুড়েছে নাচ,
প্রকৃতি দেবীর আজ
নব নব নব সাজ।

রিমঝিম রিমঝিম
পড়ছে যে বৃষ্টি,
সবার মনেতে আজ
আনন্দের সৃষ্টি।

কর্মজীবনের সুলুক সন্ধান

কেরিয়ার মাস্টার

মনোরঞ্জন মাইতি। মেদিনীপুর জেলার একগ্রামের ছেলে। গরিব বাবা-মা অনেক কষ্টেসৃষ্টে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়িয়েছে। টেনেটুনে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করার পর ঘরেই বসে আছে। পড়ার সময় আশা ছিল, পাশ করার পর একটা চাকরি-বাকরি জুটে যাবে কোথায়। কোথায় কি! যতই দিন যাচ্ছে, হতাশ হয়ে পড়ছে মনোরঞ্জন। কাজ করতে চায় সে মনেপ্রাণে। কিন্তু কী কাজ সে করবে, তা জানে না সঠিক। কোথায় কাজ করবে, তাও জানা নেই।

মনোরঞ্জন মাইতির মতো জলপাইগুড়ির মালতী মিত্রর, নদীয়ার নবীন চক্রবর্তীর, বহরমপুরের কাসেমআলির, পুরুলিয়ার রবীন হাঁসদার একই অবস্থা। এদের মতো হাজার হাজার ছেলেমেয়ে আছে, যাদের কেউ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে, কেউ শুধুই মাধ্যমিক পাশ করেছে তৃতীয় কিংবা দ্বিতীয় বিভাগে। কেউ কেউ কোনো রকমে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে। সংখ্যায় এরাই বেশি। উচ্চশিক্ষা পেয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার,, বিজ্ঞানী, শিক্ষক, অধ্যাপক হওয়ার সুযোগ পায় ক'জন?

সমাজে যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, শিক্ষক অধ্যাপকের প্রয়োজন আছে, তেমনি সমান প্রয়োজন আছে কৃষক, মজুর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, হস্তশিল্পী, টিভি মেকানিক, নার্স, ফিজিওথেরাপিস্ট, টাইপিস্ট, গাড়ির ড্রাইভার, দর্জি — এমনি অজস্র কাজের জন্যে অসংখ্য লোক। এদের ছাড়া কোনো সমাজ এগুতে পারে না। তেমনি অসংখ্য বেকারকে বহন করতে হলে সমাজ পিছিয়ে পড়ে।

সকলেরই জানা, এই ছোট কাজ, বড় কাজের ভাগটা সৃষ্টি হয়েছে প্রাচীন যুগ থেকেই। এরপর ইংরেজরা নিজেদের ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখতে ইংরেজি শিক্ষা চালু করে। সৃষ্টি হয় ইংরেজি শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণীর। এতে ইংরেজদের স্বার্থসিদ্ধি হয়েছে বটে, কিন্তু মারাত্মক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে দেশের মানুষের মানসিক জগতের। দুঃখের কথা, স্বাধীনতা পাওয়ার পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেলেও আজও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটা সেই ঔপনিবেশিক ধাঁচেই চলেছে মোটামুটি। এর সাথে যোগ হয়েছে আর একটি বিষয়। কোথায় কী ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তার জন্যে কী ধরনের যোগ্যতা লাগে — সে বিষয়ে স্কুল-কলেজগুলিতে রয়েছে তথ্য সরবরাহের অভাব। এতে ফল যা হবার তাই ফলছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই অশুভ চক্র থেকে বেরুবার পথ কী? পথ হল, যেখানে যেটুকু কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তাকে কাজে লাগানো। আর তো করতে হ'লে নিজেকে সেভাবে তৈরি করে নিতে হবে। কর্মজীবনে প্রবেশের জন্যে নিজেকে প্রশিক্ষিত করাটা খুবই জরুরী। আর সেটা করা চাই নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আগ্রহ, সুযোগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে।

আগামী দিনে কিশোর দুনিয়ার প্রতি সংখ্যাতে কোনও না কোনও কাজ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ লাভের উপায়, প্রশিক্ষণ প্রাপকের ভবিষ্যৎ কাজের সুযোগ ইত্যাদি নিয়ে তথ্য সরবরাহ করা হবে। নজর দেওয়া হবে সেই সব কাজের প্রশিক্ষণের বিষয়ে যেগুলিতে অষ্টম থেকে উচ্চমাধ্যমিকে সাধারণভাবে পাশ করা ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ আছে।

বিশ্বের নানান খবর

— চিন্ময়ী দে

একজন মানুষ সারা জীবনে কত কথা বলে?

সমীক্ষাতে জানা গেছে একজন মানুষ সারাদিনে গড়ে একঘণ্টা এবং সারা জীবনে আড়াই বছর কথা বলে। যদি একজন মানুষের এইসব কথা পুস্তকাকারে প্রকাশ করা যায় তাহলে কত পৃষ্ঠার, কত খণ্ডের বই হবে জানো কি? শুনলে তোমরা অবাক হবে যে ৪০০ পৃষ্ঠার যদি প্রতিটি বই হয় তাহলে অন্তত ১০০টি খণ্ড বা বই প্রকাশ করতে হবে।

ভারত ও ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচ

১৯২৩ সালের ২৫শে জুন লর্ডসে ভারত প্রথম সরকারীভাবে ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ খেলে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এবং আশ্চর্য হলেও সত্যি যে ভারত ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচে প্রথম জয়ী হয় ২৮ বছর পর ১৯৫২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারিতে। খেলাটি হয়েছিল চেন্নাইয়ে এবং বিপক্ষদলের নাম ইংল্যাণ্ড।

সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ

দেশটার নাম 'আইসল্যাণ্ড' হলেও এই দেশেরই একজন মানুষ যার নাম ম্যাগাসভার ম্যাগনাসিন তিনি বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছেন। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টলুইস মিসৌরিতে আয়োজিত 'বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ প্রতিযোগিতায়' বিজয়ী হয়েছে ম্যাগনাসিন। না, কোন ওজন তুলে তিনি রেকর্ড করেন নি, শুনলে অবাক হতে হয় যে, কোমরে দড়ি বেঁধে একটি ভারী লরিকে তিনি টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন।

হাঙর যাকে ভয় পায়

ভয়ঙ্কর সব হাঙরের কথা আমরা সকলেই শুনেছি। সমুদ্রের গভীরে থাকা এই হাঙর জাহাজও নাকি উল্টে দিয়েছে বেশ কয়েকবার। এইসব হাঙরদের নিয়ে বিখ্যাত বিদেশি সিনেমাও হয়েছে শুনেছো তোমরা। কিন্তু তোমরা কি কেউ শুনেছো, অতি ক্ষুদ্র সামান্য এক সামুদ্রিক জীব মেরে ফেলতে পারে বিশাল হিংস্র এই হাঙরকে? হ্যাঁ, 'হেডহগ' নামে মাত্র ১০ ইঞ্চির এক সামুদ্রিক প্রাণী জানে এইসব হাঙরকে মেরে ফেলার কৌশল। হাঙর যখন ' হেডহগ'কে খেয়ে ফেলে তখন এই ক্ষুদ্র প্রাণী হাঙরের পেটে গিয়ে ফুলে যায় আর এদের দেহ থেকে অসংখ্য বর্ষার মতো ধারালো অঙ্গ বেরিয়ে এসে হাঙরের পেট ফুটো করে দেয়। ফলে হাঙর মারা যায়।

কুইক কুইজ

গান্ধীনগর বলতে যদি গুজরাট কে বোঝায় তাহলে ইটানগর বলতে বোঝায় ক) নাগাল্যান্ড খ) আসাম গ) অরুণাচল প্রদেশ ঘ) ঝাড়খন্ড

উত্তর ৫৫ পৃষ্ঠায়

ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা

'এয়ার ইণ্ডিয়া'র মাধ্যমে ভারত ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে প্রথম ভারতীয় আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা চালু হয় ৮ই জুন, ১৯৪৮এ।

তোমরা কী কিছু বুঝতে পারলে ? না পারলে ৫৫ পাতায় দেখে নাও

রূপকথার নায়ক

মাইকেল ওয়েন

সুজন ঠাকুরতা

এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম সেরা ও জনপ্রিয় ফুটবলারটি কে? প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ ফুটবল বিশেষজ্ঞ ও সমর্থকগন প্রায় একমত। ফুটবলারটির নাম মাইকেল ওয়েন। ইংল্যাণ্ডের এই বিশ্ববন্দিত ফরোয়ার্ডটি পারফরম্যানস ও জনপ্রিয়তায় পিছনে ফেলে দিয়েছেন লুই দিগো, জিনেদিন জিদান, রিভাল্ডো, বাতিস্তুতা সহ বিশ্বের অনেক খ্যাতনামা ফুটবলারদের। ২০০০-২০০১ সিজনে এখন পর্যন্ত অসাধারণ ফুটবল খেলেছেন তিনি। আজ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের কোন খেলোয়াড় যা পারেননি সদ্য সেই কাজটি করে এসেছেন মাইকেল ওয়েন। প্রথম পর্বের খেলায় ঘরের মাঠে জার্মানির কাছে ০-১ গোলে হেরে যায় ইংল্যাণ্ড। ফিরতি পর্বে ওদের মাঠে জার্মানিকে পর্যুদস্ত করেন ওয়েন। দুর্দান্ত গতি সম্পন্ন ফুটবল খেলে তিনি ভেঙে দেন শক্তিশালী জার্মানির ডিফেন্স। ওয়েনের গতিময় ফুটবলের কাছে হার মানতে বাধ্য হয় জার্মানির তাবড় তাবড় খেলোয়াড়রা। ১৯৬৬ সালে ইংল্যাণ্ড বিশ্বকাপ জিতেছিল ঘরের মাঠে ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে। সেই ম্যাচে হ্যাট্রিক করেছিলেন জিওফ হার্স্ট। তার ৩৫ বছর পর বিদেশের মাটিতে জার্মানির বিরুদ্ধে আবার হ্যাট্রিক করলেন বাদামী চুলের অধিকারী, সম্ভবনাময় ফুটবলার মাইকেল ওয়েন। ইংল্যাণ্ডে যে এবার বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে তার পিছনে রয়েছে ওয়েন আর বেকহ্যামের অসামান্য অবদান। বিশ্বকাপের মূল পর্বের খেলায় ১০টির বেশি গোল করেছেন লিভারপুলের এই স্টাইকার। তাই মাইকেল ওয়েনকে এখন বলা হচ্ছে জয়ের নায়ক। ভবিষ্যতে ওয়েন ইংল্যাণ্ডের হয়ে সর্বাধিক আন্তর্জাতিক গোলদাতা স্যার ববি চার্লটনের ৪৯টি গোলের রেকর্ডটিই শুধু ভাঙবেন না, এই সঙ্গে ভেঙে দিতে পারেন গোলকিপার পিটার শিলটনের সর্বাধিক ম্যাচ খেলার রেকর্ডটি। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি ম্যাচে গোল করে ইংল্যাণ্ডের জয়ের পথ সুগম করেছেন মাইকেল ওয়েন। ওয়েনের পায়ে এখন জাদুর ছোঁয়া। গোলের পর গোল করে, দারুণ খেলে তিনি চমকে দিয়েছেন বিশ্বকে, আর জনপ্রিয়তায় পিছনে ফেলে দিয়েছেন লুই দিগো, জিনোদিন জিদান, রাউল গঞ্জালেজের মতো তারকা ফুটবলারদের।

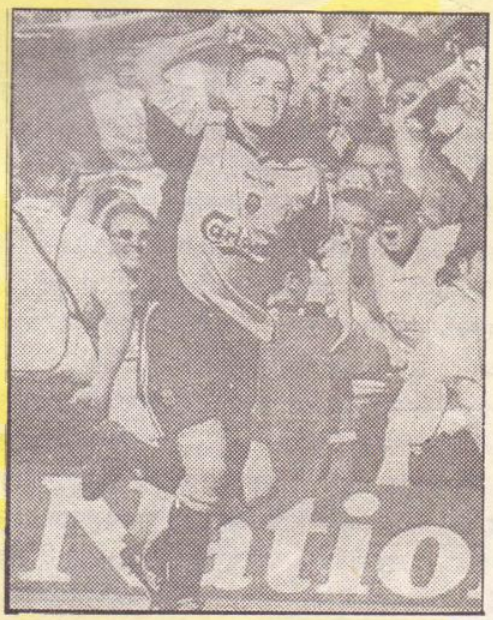

গত মরশুমে পায়ে মারাত্মক চোট পেয়ে প্রায় আট/দশ মাস মাঠের বাইরে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন মাইকেল ওয়েন। সেই সময় সমালোচকেরা বলেছিলেন ওয়েন শেষ হয়ে গেছেন, তাঁর হাঁটুর আঘাত গুরুতর, তিনি আর কোনদিন মাঠে ফিরতে পারবেন কিনা সে

বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তখন ওয়েনকে সান্ত্বনা দিয়েছেন বাবা টেরি ওয়েন ও সতীর্থ রবি ম্যাগুলার। এ বছর মাঠে ফিরে এসে সমালোচকদের সমুচিত জবাব দিয়েছেন তিনি। এখন আবার আলোর পাদপ্রদীপে বিশ্ববন্দিত ফুটবলার মাইকেল ওয়েন। কিছুদিন পূর্বে সমাপ্ত এফ. এ কাপের ফাইনালে প্রতিদ্বন্দী আর্সেনালকে একাই হারিয়ে দেন ওয়েন ৮৩ ও ৮৯ মিনিটে দু'দুটি গোল করে। এক কথায় মাইকেল ওয়েনের কাছেই পরাজিত হয় আর্সেনাল। এফ.এ কাপ জেতার আগে দীর্ঘ ছয় বছর পর ট্রফি জয়ের খরা কাটিয়ে লিভারপুলকে ইংলিশকাপ এনে দেন ওয়েন। এ'বছর কার্ডিকের মিলেনিয়াম স্টেডিয়ামে লিভারপুল এফ.সি. বার্মিংহামকে হারায় ট্রাইবেকারে ৫-৪ গোলে। এক্ষেত্রেও জয়সূচক গোলটি করেন মাইকেল ওয়েন। শুধু এই নয়, এবারের ইংলিশ লিগ জয়ী, লিগে হ্যাট্রিককারী শক্তিশালী ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের অপরাজিত আখ্যা ভেঙে দেন দুরন্ত মাইকেল ওয়েন ম্যাঞ্চেস্টারকে ১-০ গোলে হারিয়ে। আর উয়েফা কাপের ফাইনালে লিভারপুলকে স্পেনের আলভেজের বিপক্ষে ৫-৪ গোলে জিতিয়ে দলকে ২০০০-২০০১ সিজনে খেতাব জয়ের হ্যাটট্রিক করতে সাহায্য করেন ওয়েন। মাইকেল ওয়েনের গতির কাছে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে আলভেজের ডিফেন্স। লিভারপুলকে জিতিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেন ২২ বছর বয়সী দুর্দান্ত ফরোয়ার্ড মাইকেল ওয়েন। এছাড়া চ্যাম্পিয়নস লীগের যোগ্যতা নির্ণায়ক খেলায় (মূল পর্বে ওঠার জন্য) ইংল্যাণ্ডের এক প্রতিপক্ষকে ৪-০ গোলে হারিয়ে আগামী মরশুমে লিভারপুলকে উয়েফা চ্যাম্পিয়ান লিগে খেলার ছাড়পত্র আদায় করে দেন ওয়েন। এরপর তিনি করেন জার্মানির বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক। ওয়েনের খেলা দেখে মুগ্ধ জার্মানির প্রাক্তন অধিনায়ক ও কোচ ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার। তিনি উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন ওয়েনের ফুটবলের। জার্মানকে হারানোর আগে ইংল্যাণ্ডের লিভারপুল সুপারকাপ জয় করে। ১৯৭৮ সালের পর লিভারপুল সুপার কাপ জয় করে জার্মানির বেয়র্ন মিউনিখকে হারিয়ে। এই ম্যাচেও মান অব দ্য ম্যাচ হন ওয়েন। সুপার কাপ ধরে গত ছয় মাসে তারা পাঁচ পাঁচটি ট্রফি জিতেছে। আর এ জিনিস সম্ভবপর হয়েছে মূলত মাইকেল ওয়েনের অনবদ্য ফুটবলের জন্যই। অবশ্য শুধু ক্লাবের হয়েই নয়, দেশের হয়েও বেশ ভাল খেলেছেন মাইকেল ওয়েন। ইংল্যাণ্ড যে এবার বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা আদায় করতে পেরেছে তার পিছনে বেকহ্যাম ও ওয়েনের অবদান অনস্বীকার্য।

সত্তর দশকে লিভারপুল ইংল্যাণ্ডের লীগ, কাপ এবং ইউরোপের সেরা হয়েছিল মূলত কেভিন কিগানের জন্য, আশির দশকে লিভারপুলের ট্রফি জয়ের পেছনে মূল অবদান ছিল ইয়ান রাশ ও কেনি ডাগালশের। আর নতুন শতকে দীর্ঘদিনের খরা কাটিয়ে লিভারপুলকে ট্রফি জয়ে সাহায্য করছেন মাইকেল ওয়েন। কিন্তু কেভিন কিগান বা ইয়ান রাশকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছেন ওয়েন। লিভারপুল সমর্থকদের নয়নের মণি এখন ১০ নম্বর জার্সিধারী দুর্ধর্ষ ফরোয়ার্ড ওয়েন। ১৯৭৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর লিভারপুলের চেস্টার লি স্ট্রিটে জন্ম মাইকেল ওয়েনের। এখন তিনি ইংল্যাণ্ডের অন্যতম ধনী ফুটবলার। চেস্টার লি স্ট্রিটে রাস্তার উপর পরপর ছটি বাড়ি কিনেছেন। একটিতে তিনি নিজে থাকেন। অন্য পাঁচটিতে থাকেন মা বাবা ভাই বোনেরা। ওয়েনরা তিন ভাই দু'বোন। বাবার নাম টেরি ওয়েন, মার নাম জিনেট। ওয়েনের প্রেরণা তাঁর ছেলেবেলার বান্ধবী লুইসিল বনসল। বনসলের প্রেরণা ওয়েনের বড় সম্পদ। বাড়িতে অবসর সময়ে সুকার খেলেন এবং গল্প করেন মনের সাথী বনসলের সঙ্গে। মাইকেল ওয়েনের আদি বাড়ি ছিল ব্রিটেনের অখ্যাত গ্রাম হাওয়াডেনে। বাবা উইলিয়ম টেরিও ফুটবল খেলতেন, তাই ওয়েনের রক্তে ফুটবল। ছেলেবেলা থেকে ঘরকুনো ওয়েন পরিবারের সঙ্গে মিলেমিশে সময় কাটাতে ভালোবাসেন। ভালবাসেন প্রিয় ক্লাব লিভারপুলকে। বহু অর্থের প্রলোভনেও ক্লাব বদলাননি তিনি। ওয়েনের সমর্থকদের দাবী মেনে চেস্টার লি স্ট্রিটের নতুন নামকরন হতে চলেছে ওয়েনের নামে "ওয়েন স্ট্রিট"।

মাত্র চার-পাঁচ বছর আগে মাইকেল ওয়েনের রোজগার ছিল মাসে ৮০ পাউন্ড। আর সম্প্রতি ওয়েনের সঙ্গে লিভারপুলের চুক্তি হয়েছে ৮৫,০০০ পাউন্ডে। অর্থের পরিমাণ আরো বাড়ছে। আজ থেকে পাঁচ-ছয় বছর আগে লিভারপুলের খোলোয়াড়দের বুট পালিশ করতেন তিনি, আর সেই ওয়েনই এখন লিভারপুলের সবচেয়ে দামী প্লেয়ার। ১৯৯৮ সালের ১৮ মে মরক্কোর বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের হয়ে নিজের প্রথম গোলটি করে (আন্তর্জাতিক) ইতিহাসের পাতায় ঢুকে পড়েন ওয়েন। ১৮ বছর ১৬৪ দিনে প্রথম গোল। এত কম বয়সে আন্তর্জাতিক গোল ওয়েনের আগে আর কোন ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়ই করতে পারননি। গত ফ্রান্স বিশ্বকাপে ইংল্যাণ্ড হেরে গেলেও নিজের জাত চেনান ওয়েন। রোমানিয়ার বিপক্ষে দর্শনীয় গোল করার পর প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে স্বপ্নের গোল করেন তিনি। সেন্টার সার্কেলের কাছে বল ধরে দুরন্ত গতিতে তিন-চারজন খেলোয়াড়কে কাটিয়ে গোলকিপারকে পরাস্ত করে অসাধারণ গোল করেন ওয়েন। আর্জেন্টিনার বিপক্ষে সেই ম্যাচে টাইব্রেকারে ইংল্যাণ্ড হেরে গেলেও ওয়েনের গোলটিকে ফ্রান্স বিশ্বকাপে "শ্রেষ্ঠ গোল" বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এই মুহূর্তে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার সহ ইংল্যাণ্ডের প্রায় সব সাধারণ মানুষের চোখে নায়ক মাইকেল ওয়েন, তবে ওয়েনের জনপ্রিয়তা, এখন সমগ্র বিশ্ব জুড়ে। সর্বত্র সমাদৃত তিনি। মাইকেল ওয়েন এখন নায়ক থেকে মহানায়ক। বিশ্ব ফুটবলের সুপারস্টার তিনি। আসন্ন বিশ্বকাপ ফুটবলে ইংল্যাণ্ডকে জেতাতে বদ্ধপরিকর প্রতিভাবান শিল্পী ফুটবলার দুরন্ত স্টাইকার মাইকেল ওয়েন।

বিজ্ঞানের লেটেস্ট খবর

— সৌম্য রায়

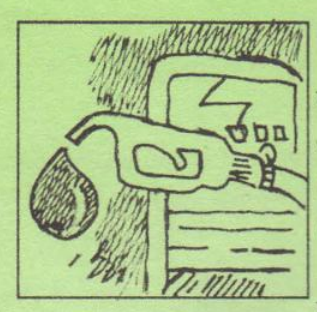

বিকল্প জ্বালানী তেল

সমস্ত পৃথিবী জুড়েই জ্বালানী তেল নিয়ে এখন প্রচুর আলোচনা ও চিন্তা ভাবনা হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, পৃথিবীতে যত খনিজ তেল সমুদ্রে মজুত আছে তাতে আরো একশ বছরও চলবে না। অথচ পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন প্রভৃতি খনিজ তেল বা 'ক্রুড পেট্রোলিয়ামের' ব্যবহার ও চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। সমস্ত মানব সভ্যতাই পেট্রোলিয়ামের যোগানের উপর নির্ভরশীল। অথচ এর মজুত ক্রমহ্রাসমান।

ভবিষ্যতের সঙ্কট এড়াতে বিজ্ঞানীরা নানারকম বিকল্প শক্তির খোঁজ করছেন। এখন ব্যবহার করা হচ্ছে আণবিক শক্তি, সৌরশক্তি প্রভৃতি। পেট্রোল, ডিজেলের সরাসরি বিকল্পের খোঁজও চলেছে। এই নিয়ে বিজ্ঞানীরা যখন খুবই চিন্তিত তখন একটি সুখবর শোনালেন ব্রাজিলের কিছু বিজ্ঞানী। তাঁরা আমাজানের গভীর অরণ্যে এক আশ্চর্য গাছের খোঁজ পেয়েছেন। এই গাছের কাণ্ড থেকে এক ধরনের তৈলজাতীয় পদার্থ মেলে যা প্রায় ডিজেলের সমগোত্রীয়। অর্থাৎ এই উদ্ভিদজ তেল ব্যবহার করে গাড়ী চালান সম্ভব। তবে এই তেল ব্যবহারে গাড়ীর ইঞ্জিনের ক্ষতি হবার সম্ভবনা যথেষ্ট। তাই ওখানকার বিজ্ঞানীরা এই গাছ যার স্থানীয় ভাষায় নাম কোপাইবা — একে নিয়ে গবেষণা করছেন। এই গাছ থেকে বেশি পরিমাণে তেল নিষ্কাষণ করে, এবং তাকে পরিশুদ্ধ করে কিভাবে ডিজেলের পরিবর্ত হিসাবে বাবহার করা যেতে পারে — তাই তাদের গবেষণার বিষয়। তাঁদের গবেষণা সফল হলে মানবজাতি ভবিষ্যতের এক বড় সঙ্কট থেকে রক্ষা পাবে, সন্দেহ নেই।

প্ল্যাসটিকের হৃৎপিণ্ড

হৃদপিণ্ড মানুষের দেহের সব থেকে প্রয়োজনীয় অংশ। এই অংশটি ছাড়া মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। হৃদপিণ্ডের নানা ধরণের রোগে বহু মানুষ ভোগেন। এই ধরণের রোগে নানা ওষুধ আছে। বিভিন্ন ধরণের অপারেশনও করা হয়। এমন কি হৃদপিণ্ড বদলানোও কোন কোন ক্ষেত্রে হয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে হৃদপিণ্ড জোগাড় করতে হয় কোন সদ্যমৃত মানুষের শরীর থেকে — যা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না।

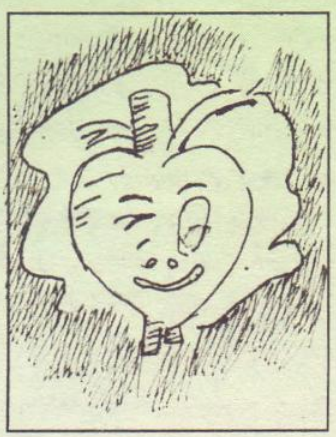

এই সমস্যা সমাধানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'এবিওমেড' নামক একটি সংস্থা গবেষণা করে বার করেছে "প্লাস্টিকের তৈরী হৃদয়"। এর ওজন প্রায় এক কিলো। এর মধ্যে আছে একটি মোটর। যা এই কৃত্রিম হৃদপিণ্ডকে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করবে। সব থেকে বড়ো সুবিধা এটাই যে মানুষের শরীর এই প্লাস্টিকের হৃদয়কে গ্রহণ করতে পারবে অতি সহজে, কোন পাশ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই।

তবে এর দাম শুনলে কিন্তু চমকে উঠতে হবে, ভারতীয় মুদ্রায় মাত্র ৩৫ লাখ টাকা।

ইন্টারনেট ZoNe

— তপন বারিক

■ **দুষ্প্রাপ্য বই প্রয়োজন?**

যে সব বই এখন প্রায় পাওয়াই যায় না অথচ ভীষণ প্রয়োজন সেক্ষেত্রে কী হবে? চিন্তার কিছু নেই। দুষ্প্রাপ্য পুরনো বই কম দামে পেতে হলে ইন্টারনেটে **usedbooks.com-** এ গেলেই হবে। হাতের কাছেই সব হাজির।

■ **পড়াশুনোর খোঁজখবর**

ছাত্র ও ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের মধ্যে সমন্বয় ও যোগাযোগ রাখার ভাল ওয়েব সাইট হচ্ছে **www.bizkool.com.** পড়াশুনোর পাট চুকে যাবার ক্ষেত্রে ও চাকরীর ও কেরিয়ারের ব্যাপারে খোঁজখবর দেবে এই ওয়েব সাইট।

■ **আশ্চর্য গ্রহ প্লুটো**

পারশিভাল লোয়েল ১৯০২ সালে প্রথম আমাদের জানিয়েছিলেন সৌরজগতে আটটি নয়, নবম গ্রহ আছে এবং তা নেপচুনের কক্ষপথের পরেই। ১৯৩০ সালে জ্যোতির্বিদ ক্লাইড টমবাঘ এই নবম গ্রহটি আবিষ্কার করলেও এই নতুন গ্রহটির নামকরণ করা হয়েছিল ১১ বছরের একটি কিশোরের প্রস্তাব অনুযায়ী। সেই থেকে প্লুটো নামকরণ এবং এই প্লুটো গ্রহ সম্পর্কে আশ্চর্য তথ্য নিয়ে হাজির

www. klx.com/clyde/pluto.html ওয়েব সাইট।

■ **জেরক্স করার প্রয়োজন নেই**

একটা গুরুত্বপূর্ণ স্কুলের বা গল্পের বই খুব তাড়াতাড়ি কপি করে নিজের কাছে রাখতে হবে। এই অবস্থায় কী করি আমরা? হয় টাইপ করি নয়তো জেরক্স-এর দোকানে গিয়ে জেরক্স করে আনি।

আজকের ব্যস্ততার যুগে এই দুটি কাজই যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ, বিরক্তিকর ও একঘেয়ে। তাহলে? চিন্তার কিছু নেই। এতো সব ঝুট ঝামেলা থেকে মুক্তি পেতে হলে 'ওয়েভ টু টেস্ট' সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারো। এজন্য তোমাকে তোমার কমপিউটারের সাথে ইন্টারনেট কানেকশন থাকা দরকার এবং কমপিউটারে একটা মাইক ও একটা সাউন্ড কার্ড থাকা প্রয়োজন। ব্যাস, এরপর বাকী কাজ করবে এই সফটওয়্যার । তুমি শুধু তোমার বইটার পাতার পর পাতা গড়গড় করে বলে যাবে আর কমপিউটার তার ওয়ার্ড প্রসেসরে তোমার কথাগুলো শুনে টাইপ করে নেবে। এরপর তুমি এই বই এর সম্পূর্ণ বিষয়গুলি পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে তোমার বন্ধুকে পাঠাতে পারো বা নিজেই কাজে লাগাতে পারো। এইজন্য তোমাকে www.research-lab.com থেকে wave to text সফটওয়্যার ডাউন লোড করতে হবে।

■ **ইংরাজী শিক্ষক**

ইংরাজী বিষয়ের কোন প্রশ্নের উত্তর হোক বা কোন **essey** হোক বা যে কোন ইংরাজী লেখা সংশোধন করার প্রয়োজন হলে হাতের কাছে টিউটর বা অভিভাবক না থাকলেও হবে। জেনে রাখা চাই শুধু **Edit Avenue. com** এই ওয়েব সাইটটি। কোন ডকুমেন্ট এই ওয়েব সাইটে পাঠালে সম্পাদকের একটি টীম লেখাটি সংশোধন ও পরিমার্জন করে পরের দিনই পাঠিয়ে দেবে। তবে এজন্য সামান্য চার্জ লাগবে।

টিউটর হলেও তো লাগত,তাই নয় কী?

■ **পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নানা ভঙ্গীর নানা অর্থ**

মালয়েশিয়ায় গিয়ে কেউ যদি কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ায় তাহলে ওদের মানুষ মনে করবে ব্যাক্তিটি রেগে আছে। ফ্রান্সে গিয়ে কাল্পনিক বাঁশি বাজাবার ভঙ্গী করলে ওদেশের মানুষ ধরে নেবে কাউকে সঙ্কেত দিয়ে জানানো হচ্ছে যে সামনের লোকটি বেশি কথা বলছে। এরকম বিভিন্ন দেশে এক একটা ভঙ্গীর অর্থ এক এক রকম। কোন্ দেশে কোন্ ভঙ্গীর কী অর্থ বোঝায় জানতে হলে যেতে হবে **www.wel of culture.com/word smart/gestures. htm.**

■ **ভারতের সম্পর্কে নানা তথ্য**

ভারতের অতীত ইতিহাস থেকে আধুনিক প্রগতি সম্পর্কে ছবি সহ যাবতীয় তথ্য পেতে হলে যেতে হবে **http://www. kamat .com** ওয়েব সাইটে।

■ **স্বাস্থ্য সম্পর্কে পরামর্শ চান?**

কীভাবে শিশুর স্বাস্থ্য পরিচর্যা করা প্রয়োজন বা বড়দের শরীরের যত্ন কীভাবে নেওয়া দরকার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শর জন্য ডাক্তারের চেম্বারে যাবার সব সময় আর প্রয়োজন নেই।

শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নানা কাজগুলো জেনে নিতে হলে বা পুষ্টি কিংবা শরীরকে fit রাখতে হলেও আমরা জেনে নিতে পারবো হেলথ সাইট থেকে। **www. good health you. com** এমনই এক জরুরি ওয়েব সাইট। এছাড়াও স্বাস্থ্যকর খাবার, ডায়েট কন্ট্রোল, মেক-আপ সহ নানা বিষয়ের খবর ও পরামর্শ পাওয়া যাবে এই ওয়েব সাইট থেকে।

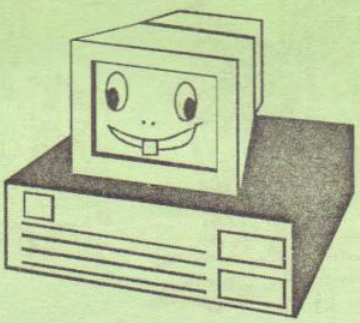

ফ্রি ডাউন লোড

কমপিউটারের সাথে কথা বলতে চাও?

তোমরা কী কখনও ভেবেছিলে কমপিউটার তোমাদের সাথে কথা বলতে পারে? হ্যাঁ, কমপিউটারও কথা বলতে পারে এবং আজ ২০০২ সালে এটা আর অসম্ভব কিছু নয়। তোমার কমপিউটার তোমার সাথে কথাবার্তা বলতে পারবে যদি তুমি Talk to me সফট্ওয়ার ব্যবহার করো। এই জন্য যদি কমপিউটারে ইন্টারনেট কানেকশান থাকে তাহলে http: //www. talk to me. net থেকে এই নানা বিষয়ের বৈচিত্র্যপূর্ণ সফট্ওয়ার তোমরা ডাউনলোড করে নিতে পারো।

পতাকা কীভাবে এলো

যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরলেন ডেনমার্কের বীর রাজা ভালদিমার। শ্রান্ত দেহ। আকাশের দিকে তাকালেন রাজা আপন মনে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আকাশ অস্তগামী সূর্যের রং-এ লাল। হঠাৎ রাজা ভালদিমারের চোখে পড়ল লাল আকাশের পথে সাদা চিহ্নের মত একটি দৃশ্য। অবাক হয়ে ভাবলেন, এটা নিশ্চয়ই কোন শুভচিহ্ন। এরপর থেকেই তিনি সেই 'শুভচিহ্ন'কে

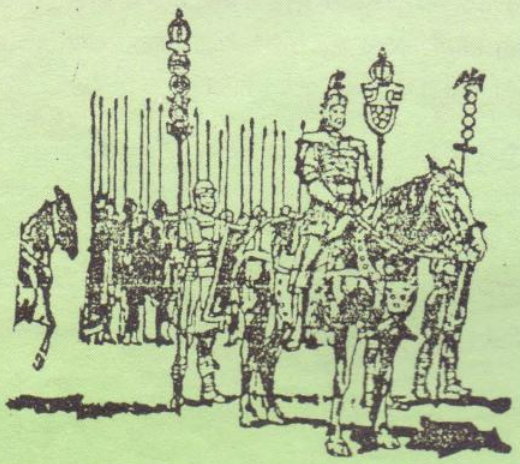

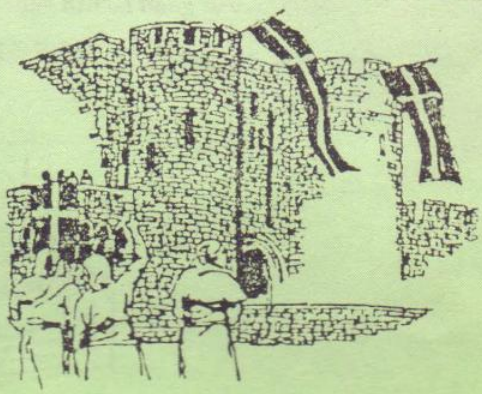

তার পতাকায় ব্যবহার করতে শুরু করলেন। এই ঘটনা ১২১৯ খ্রিস্টাব্দের। সেই থেকে প্রায় ৮০০ বছর ধরে ডেনমার্ক সেই লাল রং-এর ওপর সাদা ক্রস চিহ্ন আঁকা পতাকাই ব্যবহার করছে।

হাজার হাজার বছর আগে ইজিপসিয়ানরা সর্বপ্রথম পতাকার মতো প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করতো। এই প্রতীক চিহ্নগুলো অবশ্য আজকের পতাকার মত দেখতে ছিল না। তারা লম্বা লোহার দণ্ডের মাথায় নানারকম প্রতীক চিহ্ন লাগিয়ে দিত। এগুলোকে সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে বহন করে নিয়ে যেত। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই প্রতীক চিহ্নগুলি যুদ্ধজয়ের সহায়ক হবে। পরে আসিরিয়ী গ্রীক রোমানরাও যুদ্ধক্ষেত্রে এইরকম প্রতীক ব্যবহার করতে শুরু করে। সেসময় যুদ্ধক্ষেত্রে যে সৈনিকটি পতাকা বহন করত সে যদি মারা যেত কিংবা আহত হত তাহলে তার দলের অন্য সৈন্যরা তাকে ঘিরে থাকত — যাতে শত্রু পক্ষের সৈন্য ঐ পতাকা ছিনিয়ে নিতে না পারে। যদি শত্রু পক্ষ ঐ পতাকা অধিকার করে নিত-তাহলে বহু সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করত।

ভারতের জাতীয় পতাকার যে রূপ আমরা দেখতে পাই তা কিন্তু একবারেই হয়নি। বহু বছর ধরে বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান জাতীয় পতাকার সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের জাতীয় পতাকার এ ক্রমপরিবর্তনের কেটা সুন্দর তিহাস আচে। ভারতের সর্বপ্রথম জাতীয় পতাকার রং ছিল হলুদ ও সবুজ রঙের। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ আগস্ট কলকাতার পারসী বাগান পার্কে এই পতাকা উত্তোলন করা হয়। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে

প্যারিসে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা ম্যাডাম কামার নেতৃত্বে ভারতের একটি জাতীয় পতাকা প্রস্তুত করেন। এই পতাকার রং ছিল গৈরিক, সাদা এবং সবুজ। গৈরিক বা গেরুয়া অংশে আটটি তারা, মাঝখানের সাদা অংশের হিন্দীতে লেখা 'বন্দেমাতরম' এবং নিচে সবুজ অংশে বামদিকে সূর্য এবং ডান দিকে চাঁদ আঁকা। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে হামরুল আন্দোলনের সময়ও একটি জাতীয় পতাকা প্রস্তুত করা হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজী নিজেই একটি পতাকা প্রস্তুত করেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় পতাকা প্রস্তুত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। ঐ বছরই একটি তিন রঙা পতাকা জাতীয় পতাকা হিসাবে গৃহীত হয়। উপরে গৈরিক, মধ্যে সাদা এবং নিচের অংশ সবুজ। সাদা অংশে চরকার ছাপ। অবশেষে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২২শে জুলাই চরকার বদলে মহামতি সম্রাট অশোকের স্তম্ভের নীচের অংশের চক্রটি বসান হয়। গৈরিক রং ত্যাগ, সাদা শান্তি এবং সবুজ রং সৌর্য ও বিশ্বাসের প্রতীক।

পতাকা নিয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে নেওয়া যাক। দক্ষিণ মেরুতে প্রথম যে দুটি দেশের পতাকা পোঁতা হয় তা হল, নরওয়ে ও গ্রেট ব্রিটেন পুঁতেছিলেন ক্যাপ্টেন স্কট ও আমুণ্ডসেন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে এডমণ্ড হিলারী এবং তেনজিঙ নোরগে এভারেস্ট শৃঙ্গে উঠে পর চারটি পতাকা পোঁতেন — রষট্রসঙ্ঘ, গ্রেটবৃটেন, নেপাল এবং ভারতের। চাঁদের মাটিতে সর্বপ্রথম পৌঁছায় রাশিয়ার পতাকা। লুনা-২ উপগ্রহটি ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে চাঁদের মাটিতে ছোট ছোট রাশিয়ার পতাকা ছড়িয়ে দেয়। আর ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে নীল আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা চাঁদের মাটিতে পোঁতেন।

পতাকা নিয়ে অনেক কথাই হলো। কিন্তু এই পতাকা নিয়ে পড়াশোনা করা, চর্চা করাকে কি বলে? ভোকসিলোলজি । এই শব্দটি এসেছে লাটিন সব্দ থেকে।

— গুনেন শীল

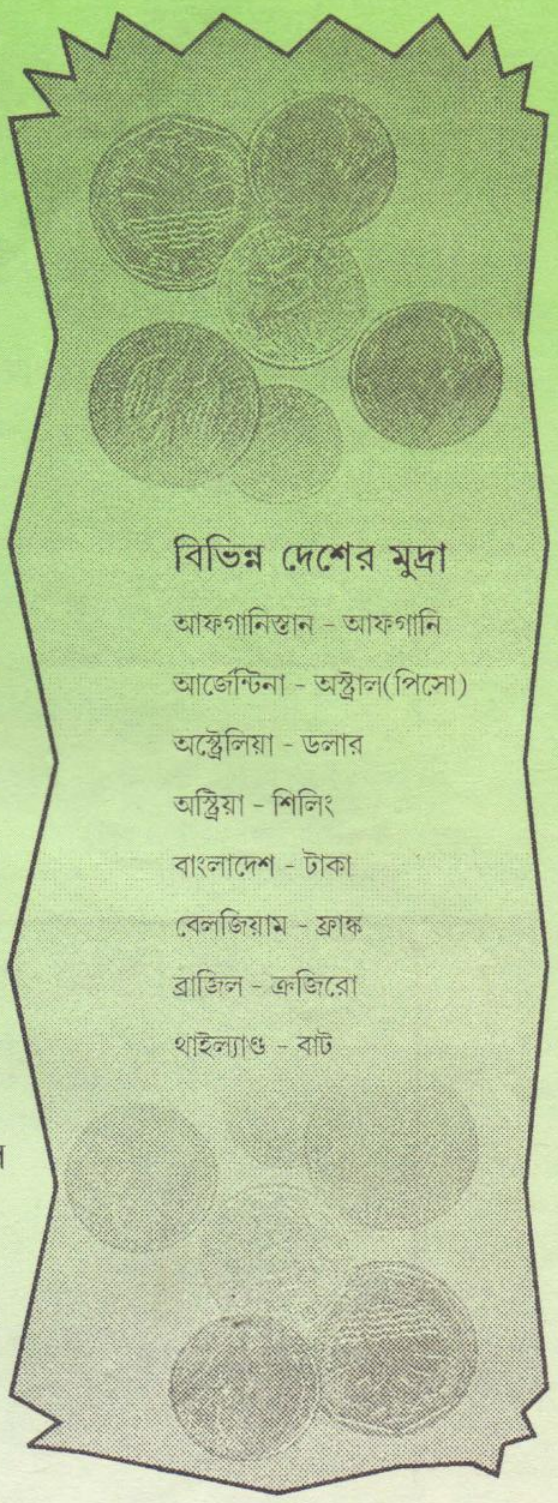

বিভিন্ন দেশের মুদ্রা

আফগানিস্তান - আফগানি

আর্জেন্টিনা - অস্ট্রাল(পিসো)

অস্ট্রেলিয়া - ডলার

অস্ট্রিয়া - শিলিং

বাংলাদেশ - টাকা

বেলজিয়াম - ফ্রাঙ্ক

ব্রাজিল - ক্রুজিরো

থাইল্যাণ্ড - বাট

জি.কে. প্রশ্নমালা

১) পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র

ক) পাকিস্তান খ) সৌদি আরব গ) ইরান ঘ) ইন্দোনেশিয়া।

২) প্রতিবন্ধী খেলোয়াড় মাসুদুর রহমান যে খেলার জন্য বিখ্যাত

ক) টেনিস খ) সাঁতার গ) দাবা ঘ) শুটিং

৩) ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট

ক) কে মুথাইয়া খ) জগমোহন ডালমিয়া গ) জে. ইরানী ঘ) জে. লেলে।

৪) ১৯৯৮ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল জয়ী দেশ

ক) ফ্রান্স খ) আর্জেন্তিনা গ) ব্রাজিল ঘ) নেদারল্যাণ্ড

৫) ২০০৩ সালে ক্রিকেট বিশ্বচ্যাম্পিয়ানশিপে অংশ গ্রহণ করবে এমন দেশের সংখ্যা —

ক) ৮টি খ) ১২টি গ) ১০টি ঘ) ১৪টি

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানী, রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর নাম

রাজ্য	রাজধানী	রাজ্যপাল	মুখ্যমন্ত্রী
অন্ধ্রপ্রদেশ	হায়দ্রাবাদ	ডঃ সি. রঙ্গরাজন	এন. চন্দ্রবাবু নাইডু
অরুণাচল প্রদেশ	ইটানগর	অরবিন্দ দাভে	মুকুট মিথি
অসম	দিসপুর	এস.কে. সিন্‌হা	তরুণ গগৈ
উত্তর প্রদেশ	লক্ষ্মৌ	বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী	রাজনাথ সিং
উত্তরাঞ্চল	দেরাদুন	সুরজিৎ সিং বারনালা	ভগৎ সিং কোশিয়ারি
উড়িষ্যা	ভুবনেশ্বর	এম.এম. রাজেন্দ্রণ	নবীন পট্টনায়ক

(ক্রমশঃ)

পড়াশুনা

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা জেনে রাখো

বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়
প্রধানশিক্ষক, কসবা জগদীশ বিদ্যাপীঠ

শিক্ষায় শিশু বা কিশোররাই মধ্যমনি। কারণ তাদের কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে শিক্ষার আয়োজন। গড়ে ওঠে পরীক্ষা ব্যবস্থা। আর এই ব্যবস্থায় শিক্ষক একদিকে যেমন তাঁর অভিজ্ঞতা এবং জীবনের আদর্শ দিয়ে গড়ে তুলবেন ভবিষ্যৎ নাগরিকদের, অন্যদিকে আমাদের শিক্ষার্থী ভাইরাও তাদের প্রবণতা, আগ্রহ প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করে স্বীয় ভাণ্ডারকে পুষ্ট করে তুলবেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সবচেয়ে বড় কর্তব্য ও দায়িত্ব হল — শিশু বা কিশোর শিক্ষার্থীদের আজন্ম পরিচিত গৃহ পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে — আদর্শ, বিনয়, শৃঙ্খলা প্রভৃতি অনুশীলনের মাধ্যমে তাকে গড়ে তোলা। শিক্ষকমশাইদের নিজেদের জীবনব্যাপী সাধনা দিয়ে ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতে হবে — কেবলমাত্র জ্ঞানার্জনের গণ্ডিতেই শিক্ষা আবদ্ধ নয়।

আমাদের কিশোর শিক্ষার্থী বন্ধুদের সামনেই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষা নিয়ে অনেক ভয়, উদ্বেগ তাদের মধ্যে কাজ করে। কারণ এটাই জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা। একেবারে অজানা এক শঙ্কা অনেককেই ভাবিয়ে তোলে। পিতামাতারাও এ ভাবনার অংশীদার হয়ে যান স্বাভাবিক কারণে। আমাদের **কিশোর দুনিয়া** পত্রিকা দায়িত্ব নিতে চায় — সেই ভয়ভীতি কাটানোর। কিশোর বন্ধুরা পড়ে দেখো তো পরীক্ষা নিয়ে নীচের লেখাটা কেমন লাগে!

যারা মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবে তাদের পরীক্ষা দানের প্রথম প্রবেশাধিকার হ'ল — Admit Card। যেটি পরীক্ষা শুরুর মাত্র ৪/৫ দিন আগে তোমাদের হাতের নাগালে আসে। খুব ভালো করে Admit Cardটি তোমাদের দেখে নিতে অনুরোধ করি। তোমরা দেখবে তোমাদের Admit Card এ তোমাদের নাম ও বাবার নামের পরেই Registration No এবং Roll ও No দেওয়া থাকে। এইসব Noএ অনেকগুলো করে সংখ্যা পরপর দেওয়া হয়। যা দেখে তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগে — এত সংখ্যা কেন? এর কি সত্যিই কোন প্রয়োজনীয়তা আছে? কিশোর বন্ধুদের এই কৌতূহল নিরসন হবে আমাদের এই লেখা পড়ে। একটা Admit card এর নমুনায় তোমরা দেখবে — কোনো একজন পরীক্ষার্থীর Rollএ লেখা আছে A6071এবং Noএ লেখা আছে 0024। এখানে Rollএর A, B, C, D প্রভৃতি Letter এ বোঝান হয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিকে। অর্থাৎ ইংরাজী Letterএ বুঝতে হবে District। এরপর তিনটি অঙ্কে আমরা উল্লেখ করেছি 607। এটি হল যে Center এ বসে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে সেখানকার Center Code। এর পরেই তোমরা দেখবে 1, 2, 3, 4 প্রভৃতি সংখ্যা লেখা আছে। এখানে 1এর অর্থ Male candidate যারা Regular হিসাবে পরীক্ষা দেবে। 2 থাকলে বুঝতে হবে Famale Candidate Regular। 3 থাকলে বুঝতে হবে Male Continuing Candidate। 4 থাকলে বুঝতে হবে Continuing Female Candidate। এছাড়াও 5 এবং 6 সংখ্যাও No এর মধ্যে দেখতে পাবে। 5 থাকলে বুঝতে হবে Compertmental Male এবং 6 থাকলে বুঝতে হবে Compertmental Female candidate। এবার Registration Noএর ব্যাপারে জানাই — এক্ষেত্রে আছে D 2 026 001-015। এখানে অনেকগুলো সংখ্যা পরপর বসানো দেখে আমরা অবাক হবোই। কিন্তু এক্ষেত্রেও কমপিউটারের এই নাম্বারের

প্রত্যেকটিতে এক একটি ভাবনা বোঝানো আছে। যেমন ধরো প্রথম থেকে D2 এর অর্থ D মানে District বা জেলা। তারপরের 1, 2, 3 প্রভৃতির অর্থ মহকুমা বা Subdivision। এরপরের তিনটি অঙ্কের অর্থ — স্কুল ইনডেক্স নাম্বার। এরপরের দুটি অঙ্ক থেকে বুঝতে হবে কোন বছরে Board বা Council এ নাম রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে তার বিবরণ। যেমন - 00 অর্থে 2000 সাল, 01 অর্থে 2001 সাল এরকমই 03 হলে 2003 সাল ইত্যাদি। এরপর আবার 1 অথবা 2 দিয়ে শেষ অঙ্ক 1 এ Male এবং 2 এ Female।

কিশোর বন্ধুরা তাহলে বুঝলে তো — Admit Card অন্তর্নিহিত বিষয়।

আবার তোমাদের আরো নিশ্চিন্তে পরীক্ষা দেওয়ার কিছু খবর দিই। ধরো কোন পরীক্ষার্থী বন্ধু প্রথম দিন পরীক্ষায় বসে খাতায় রোল-নাম্বার লিখতে ভুল করেছ কিংবা একেবারেই লেখনি, অথবা রোল নাম্বার ও রেজিস্ট্রেশন নাম্বারের একটি ঠিক লিখেছ। তাদের ক্ষেত্রে জানিয়ে রাখি — একেবারে ভয় বা উদ্বেগ নয়, পরের দিন ঠিক ঠিকভাবে লিখবে এবং আগের দিনের ঘটনাটি আগেভাগেই অভিভাবকের মাধ্যমে দরখাস্তের আকারে লিখে একটি কপি পরীক্ষা কেন্দ্রে এবং একটি কপি বোর্ডের দপ্তরে জমা দেবে। তাহলেই পরীক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকেরা পরীক্ষার্থী বন্ধুদের সাহায্য করবেন।

কিশোর দুনিয়ার দপ্তরেও তোমরা তোমাদের পড়াশোনা সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা জানাতে পারো। এই পত্রিকা এখন থেকে মাসে মাসে বেরোবে। তোমাদের যে কোন প্রশ্নের উত্তর যাতে পরের সংখ্যাতেই জানতে পারো তার ব্যবস্থা করা হবে।

আসলে কিশোর দুনিয়া তোমাদের নিজস্ব পত্রিকা। এই পত্রিকার সঙ্গে তোমরা ঘরোয়া সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে শুধু মাত্র চিঠি লিখে। তোমাদের নিয়ে বাবা-মায়েদের তো চিন্তার শেষ নেই। এখন থেকে সেই চিন্তা আমাদেরও কিছু করতে দাও। আর একটা কথা খুব তাড়াতাড়ি তোমরা কে কী হতে চাও আমাদের জানাও। আমাদের বিশেষজ্ঞরা তোমারের ইচ্ছাপূরণে কি ভাবে সাহায্য করা যায় তার পরামর্শ দেবেন। তোমাদের অনেক অজানা জিনিস কত সহজে যে জানা হয়ে যাবে তা তোমরা বুঝতেই পারবে না।

প্রথম সংখ্যাতে তাহলে এটুকুই। সবাই শুভেচ্ছা নিও কিন্তু।

ছোটদের ভাল লাগার যত বই

কুন্তল মিত্র'র

তোতাই ও তার বন্ধু রণ্ডার

অফবিট পাবলিশিং

ব্লক-এ পি-৩১৮ ফ্ল্যাট -৩ লেকটাউন

কলকাতা - ৭০০০৮৯

বই পাড়ার যাবতীয়

ছাপার কাছে অদ্বিতীয়

ADWAVE

Communication

১০৫/৩ নৈনানপাড়া লেন

কলকাতা - ৩৬

জোকস্

★ রোগী

দাঁতের ডাক্তার ঃ কোন দাঁতটা আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে?

রোগী(সিনেমা হলের লাইটম্যান) ঃ ব্যালকনীর বাঁদিক থেকে দ্বিতীয়টা।

★ মাছ

গৃহবধূ ঃ মাছটা সকালে ভাজার আগে তুমি সেটাকে জলে ধুয়ে নিয়েছিলে তো?

পরিচারিকা ঃ মাছটাকে আবার জলে ধোয়ার প্রয়োজন মনে করিনি। কারণ ওটা তো সারাজীবন জলেই তো ছিলো।

★ ফোরম্যান

ফ্যাক্টরির মালিক ঃ ফোরম্যান আপনাকে থাপ্পড় মারল কেন?

শ্রমিক ঃ আসলে ফোরম্যানের কাজ হচ্ছে সবাই ঠিকমতো কাজ করছে কি না তা ঘুরে ঘুরে দেখা।

ফ্যাক্টারির মালিক ঃ হ্যাঁ, সে তো জানি। কিন্তু আপনাকে উনি থাপ্পড় মারলেন কেন?

শ্রমিক ঃ আসলে তিনি আমাকে হিংসে করতেন কারণ অন্য শ্রমিকভাইয়েরা তো আমাকেই ফোরম্যান মনে করতো।

★ দুই বন্ধু

অমল ঃ জানিস্, চন্দনের বাবা যখন কথা বলে তখন সারা পশ্চিমবাংলার মানুষ শোনে।

বিমল ঃ চন্দনের বাবা বুঝি বিখ্যাত কোন ব্যক্তি?

অমল ঃ না রে, ওর বাবা রেডিওর ঘোষক।

★ দাঁত

রোগী ঃ ডাক্তারবাবু দাঁতটাকে তুলতে কতক্ষণ সময় লাগবে?

ডাক্তারবাবু ঃ চিন্তা করবেন না। দু' সেকেণ্ড সময় লাগবে মাত্র।

রোগী ঃ আর খরচ কত পড়বে ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু ঃ পঞ্চাশ টাকা।

রোগী ঃ মাত্র দু' সেকেণ্ডের জন্য পঞ্চাশ টাকা লাগবে?

ডাক্তারবাবু ঃ বেশ। তাহলে আপনি যদি চান তাহলে অত্যন্ত অল্প অল্প করে তুলতে থাকবো।

— প্রবীর চক্রবর্তী

স্বাস্থ্য

ছোটদের দাঁতের সমস্যা

ডঃ দেবাশিস গুহ বি.ডি.এস.
দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ

জন্মগ্রহণের পর থেকেই শিশুকে ঘিরে বাবা-মায়ের শুরু হয়ে যায় নানান চিন্তা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। খুদে ঐ মানুষটি ছোটখাটো নানা অসুখ বাধিয়ে বাবা-মাকে করে তোলে ব্যতিব্যস্ত। আর এর মধ্যে বেশ কমন একটা সমস্যা হল দাঁতের সমস্যা। তবে, সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য রয়েছে সমাধানের নানা পথ। আধুনিক চিকিৎসায় সুন্দর হাসি ফুটিয়ে তোলা আজ আর কোন ব্যাপারই নয়। আর এই জন্যই চাই সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা।

তাই, আসুন জেনে নিই ছোটদের দাঁত সংক্রান্ত নানান সমস্যা। কেনই বা সে সব সমস্যার উদ্ভব? আর, সমস্যা সৃষ্টি হলে সমাধানের কী বা পথ?

কেরিস - দাঁতের নানান সমস্যার মধ্যে কেরিসের সমস্যা সব থেকে বেশি। 'কেরিস' শব্দটি একটি ডাক্তারি পরিভাষা। সহজ কথায়, এর অর্থ হল , দাঁতের ক্ষয়। খুব চলতি কথায় অনেকেই বলেন 'দাঁতের পোকা'। তবে প্রসঙ্গত, জেনে রাখা দরকার, 'দাঁতে পোকা' বলে কিছু নেই। অনেকেই অজ্ঞতাবশত কোন গাছের শিকড় অথবা টোটকা কিংবা মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে দাঁতে 'পোকা'বের করে দেন। এটা একেবারে কুসংস্কার এবং একধরণের জাগলারি। এভাবে কখনই 'কেরিস' সমস্যার সমাধান হয় না।

আসল কথা হল, মুখের লালায় বসবাসকারী অ্যাসিড নিঃসরণকারী কিছু জীবাণু দ্বারা গৃহীত খাদ্যের শর্করা ও শ্বেতসার জাতীয় অংশ জারিত হয়ে অ্যাসিডে পরিণত হয়; যা দাঁতের এনামেলের ক্ষয় সৃষ্টি করে। এই ক্ষয়িত অংশ বাড়তে বাড়তে ডেন্টিন বা পালপ্ অংশ আক্রান্ত হলে তীব্র যন্ত্রণা হয়।

কেরিস সম্পর্কে আরও সহজভাবে বলতে গেলে, এটা হল জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়ে দাঁতের ক্ষয়। সেই ক্ষয়ে যাওয়া অংশে অনেক সময় দাঁতে গর্তেরও সৃষ্টি হয়।

তাই কেরিসের জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত সঠিক চিকিৎসা। যাকে ফিলিং বলে। সেই পদ্ধতিতেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। প্রয়োজনে সঙ্গে কোন ওষুধ খাওয়া।

মাড়ি থেকে রক্ত পড়া - ছোট ছেলে মেয়েদের অনেক সময়ই মাড়ি থেকে রক্ত পড়ে। দাঁতের সঠিক পরিচর্যার অভাবে জীবাণু সংক্রমিত হয়েই এই ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়।

দাঁত না বেরোনোর সমস্যা - দুধের দাঁতের মোট সংখ্যা কুড়ি। ওপরের চোয়ালে ১০টি ও নিচের চোয়ালে ১০টি। সাড়ে পাঁচ-ছ'মাস বয়সে সাধারণত নিচের চোয়ালের সামনের দুটো দাঁত প্রথমে বের হয়। গঠনগত বৈষম্য, শারীরিক ত্রুটি ইত্যাদি কারণে এই বয়সের দাঁত ওঠার হেরফের হতেই পারে। তবে বয়স যদি দশ মাস থেকে এক বছর পেরিয়ে যায় এবং যদি কোন

দাঁত না বেরোয়, তখন কিন্তু দাঁতের চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই জরুরি।

দাঁত না বেরুনোর সমস্যা দু'রকম। যেমন — একেবারেই কোন দাঁতই না বেরোনো। যাকে বিজ্ঞানসম্মত ভাষায় বলা হয় Complete Anodontia। যদিও এই সমস্যা খুবই বিরল আর Partial Anodontia বা আংশিক দাঁত না বেরোনোর সমস্যা তো আছেই। তবে, আর এক ধরনের সমস্যা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়। তা হলো, দুধের দাঁত সময় মত না পড়া ও পরিণত বয়সের দাঁত সময় মত না ওঠা।

এই দু'ধরনের সমস্যার সহজ মোকাবিলার জন্য রয়েছে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান।

গঠনগত ও অন্য কারণজনিত সমস্যা - অনেক সময় এমন সব দাঁতের সমস্যা দেখা দেয়, যাদের সরাসরি দাঁতের সমস্যা বলা যায় না। যেমন, কোন কোন শিশুর ঠোঁট-কাটা থাকে কিংবা তালু কাটা থাকে। এগুলোCongenital oro-facial deformity। সেই সব ক্ষেত্রে ঐ সব সমস্যা থেকে দাঁতের সমস্যা দেখা দিতেই পারে। তবে, এই সমস্যাগুলি জন্মগত সমস্যার পর্যায়েই পড়ে।

এছাড়া, নানা বদ অভ্যাস থেকেও দাঁতের সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন ধরুন, কারও কারও রয়েছে আঙুল চোষা, জিভ বার করার প্রবণতা, ঠোঁট কামড়ানো ইত্যাদি সব বদ অভ্যাস।

কখনও নাকের হাড়ের বিচ্যুতির ফলে অথবা ক্রমাগত গলায় সংক্রমণের কারণে মুখ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালানোর অভ্যাস থেকে দাঁতের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

এসব ক্ষেত্রে সমস্যাগুলি হল, উঁচু-নীচু বা অসমান দাঁত । তার থেকে দাঁত ও মাড়ির ক্ষয় ও ঠিকমতো পরিষ্কার না করতে পারার জন্য মাড়ির প্রদাহ।

সমাধান - আগে ভাবা হত, দাঁতের সহজ সমাধান হল ক্ষতিগ্রস্ত দাঁতটিকে তুলে ফেলা। কিন্তু পাল্টে গেছে চিকিৎসার ধ্যান-ধারনা। আধুনিক চিকিৎসায় দাঁত না তুলেই ক্ষতিগ্রস্ত দাঁতগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। মনে রাখা দরকার, দাঁত তুলে ফেলাই সমস্যার সমাধান নয়। কেননা, দুধের দাঁতের অনেক কাজ কর্ম থাকে। যেমন, সঠিক সময় পর্যন্ত দুধের দাঁতের অবস্থিতি চোয়ালের স্বাভাবিক গঠনকে সাহায্য করে।

তবে ক্ষেত্র বিশেষে দুধের দাঁতও তুলে ফেলা উচিত। না হলে, পরিণত দাঁত এলোমেলো হয়, অর্থাৎ স্থায়ী দাঁত ঠিকমতো জায়গায় উঠতে পারে না। কখনও বা আবার ভিতরেও থেকে যায়। আক্কেল দাঁতও ভিতরে থেকে যাওয়ার ফলে সমস্যা দেখা দেয়। অনেক সময় কেরিস ছাড়াও আঘাত থেকে সমস্যা দেখা দিতে পারে। পরে যা থেকে বিভিন্ন ধরণের দাঁত-সংক্রান্ত সিস্ট বা ওরাল টিউমার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য রয়েছে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। এই সমস্ত চিকিৎসাগুলি হল স্কেলিং, রুট-ক্যানেল ট্রিটমেন্ট সংক্ষেপে যা RCT, ক্ষতিগ্রস্ত দাঁত তুলে স্থায়ী দাঁত বসিয়ে দেওয়া (Implant) ইত্যাদি সব পদ্ধতি।

'রুট-ক্যানেল ট্রিটমেন্ট' সাধারণত বড়দের দাঁতের সমস্যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ছোটদের পদ্ধতির ডাক্তারি পরিভাষা হল — পালপেকটোমি ও পালপোটোমি। বড়দের RCT-র সঙ্গে সঙ্গে এই পদ্ধতির পার্থক্য আছে। তবে, বলা যেতে পারে এটি আংশিক RCT পদ্ধতি।

যখন অসময়ে একান্তই দাঁত তুলে ফেলতে হয়, তখন আধুনিক চিকিৎসায় স্পেস-মেইনটেনার থেরাপি করা হয়।

আর ভবিষ্যতের জন্য রয়েছে অন্যান্য অতি আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা।

বদ-অভ্যাস থেকে দাঁতের সমস্যার সমাধানে তথা চিকিৎসার জন্য প্রথম ধাপই হল বদ অভ্যাস বন্ধ করা। অনেক সময় অনেক বদ অভ্যাসে শিশু এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে, নিজের থেকে তা আর কিছুতেই রোধ করতে পারে না। তার জন্য রয়েছে আধুনিক ব্যবস্থা, যাকে বলা হয় 'HABIT BREAKING APPLIANCE' থেরাপি। অর্থাৎ বিভিন্ন জিনিস দিয়ে বদ অভ্যাস পরিবর্তন করা। যেমন, মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়া বন্ধ করার জন্য ওরাল স্ক্রীন দিয়ে দেওয়া।

যাদের একেবারে দাঁত উঠছে না, তাদের চিকিৎসার জন্য প্রথমেই দরকার এক্স-রে করা। এক্স-রের ছবি দেখেই চিকিৎসক বুঝে উঠতে পারবেন সমস্যার উৎস কোথায় ও কেমন হবে ভবিষ্যৎ চিকিৎসা পর্যায়।

আবার কখনও কখনও কোন বিশেষ একটি জায়গায় দাঁত ওঠে না। এক্ষেত্রেও দরকার প্রথমেই এক্স-রে করা। এই ধরনের সমস্যা প্রায়ই দেখা যায়। এই ধরনের সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসক অপেক্ষা করেন কিছু বছর। আসলে দেখে নেওয়া দরকার অন্য কোন সমস্যা থেকে দাঁত উঠতে বাধা পাচ্ছে কি না। যেমন, থাইরয়েড বা ঐ জাতীয় কোন সমস্যা সংক্রান্ত কি না। সাধারণত ১০ কিংবা ১২ বছর বয়সের পর বিকল্প স্থায়ী দাঁত তৈরির চিকিৎসা শুরু করা হয়।

কিছু সচেতনতা - ' Prevention is better than cure' — এই প্রবাদ বাক্যটি চিরাচরিত সত্য। রোগ দেখা দেওয়ার আগেই যদি সচেতন থাকা যায়, তাহলে যে কোন সমস্যার সহজ মোকাবিলা সম্ভব কিংবা সহজেই 'বুড়ো আঙুল' দেখানো যায়।

তাই সচেতনতার কিছু টিপ্‌স্‌ —

দিনে দু'বার ব্রাশ করা উচিত।

সঠিক পদ্ধতিতে ব্রাশ করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। যেমন — নীচের দাঁত নীচের থেকে ওপরে আর ওপরের দাঁত ওপর থেকে নীচে ব্রাশ করা উচিত। বাইরের ও ভিতরের দু'দিকের দাঁতের স্তরই সমান পরিস্কার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ফ্লোরাইডযুক্ত টুথপেস্ট ব্যবহার করুন, শিশুকে ব্যবহার করতে দিন।

খাদ্য অভ্যাস সম্পর্কে সচেতন থাকুন। এই প্রসঙ্গে প্রথম কথা হল চিবিয়ে খাবার অভ্যাস গঠন করা। দ্বিতীয় হল, প্রোটিন ও শাকশব্জি খাওয়া। আর কম খাওয়া উচিত শর্করা জাতীয় খাবার। বিশেষ করে যে সমস্ত খাবার চিটচিটে। যেমন — চকলেট, ক্যাডবেরী, লজেন্স ইত্যাদি সব ছোটদের আকর্ষকও লোভনীয় খাবার যত পরিমাণে কম খাওয়া সম্ভব। তবে, দুর্বার আকর্ষণ রোধ করা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অসম্ভব। তাই, খাওয়ার পরেই ব্রাশ করে নেওয়া উচিত। এছাড়া, দুধ, আইসক্রীম, কোল্ড ড্রিংক্স ইত্যাদি খাবার যত বারই খাবে ততবারই খাওয়ার পরে দাঁত ও মাড়ি ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এসব খাবার ছেড়ে পরিবর্তে পেয়ারা আপেল, কাঁচা-ছোলা, শশা, আখ, ভূট্টা, সজনে ডাঁটা, মুড়ি, চিঁড়ে ইত্যাদি খাবারের দিকে শিশুর আগ্রহ তৈরী করা।

কেরিসের সমস্যার সম্পর্কেও সচেতন থাকা দরকার। কেননা, ছোটরা কেরিসের সমস্যায় ভোগে অন্যান্য সব সমস্যার তুলনায়। তাই দাঁত পরিচ্ছন্ন রাখুন। কেরিস হয়ে গেলে চটজলদি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

অমর্ত্ত সেন তথ্য ও তত্ত্ব ৫০
আনন্দ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
মানুষের কাহিনী ১৫০
ডঃ সন্তোষ কুমার বিশ্বাস
বাংলা গদ্য কবিতার উদ্ভব ও বিকাশ ১০০
শৈলজানন্দ জীবন ও সাহিত্য ৪০
অচিন্ত সরকার
আলাদীনের আংটি ৩০

পরিবেশক
সাহিত্য শ্রী
৭৩, এম.জি. রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

'কিশোর দুনিয়া'

পত্রিকার প্রতি রইল

আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

শ্রাচী সিকিউরিটিস

কলকাতা

প্রবন্ধ

মহাবিশ্বে পৃথিবীর জীবরা কি একা!

ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। রীতিমত হইচই শুরু হয়ে গিয়েছিল বিজ্ঞানীদের মহলে। বিজ্ঞানীরা বেশ দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন। একটা নতুন কিছু খুঁজে পেতে চাইছিলেন। জানাগিয়েছিল পৃথিবীর কাছাকাছি কোন মহাজাগতিক বস্তুই এই দুশ্চিন্তার কারণ। তবে এতো হবারই কথা। ৬৫০ লক্ষ বছর আগেকার কথা মানুষ তো জানে। ডাইনোসরের মত বিপুলাকায় চেহারার প্রাণীরাও রেহাই পায় নি। প্রজাতিটাকেই চলে যেতে হয়েছিল পৃথিবী ছেড়ে। তাও সেই মহাজাগতিক বস্তুর উপদ্রবেই। যদিও এ নিয়ে অনেক মত আছে। সকলেই ডাইনোসরদের লুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণ বলে এটাকেই মানেন না। আসলে এইসব মহাজাগতিক বস্তুগুলো কিন্তু খুব ছোটখাট নয়। তারে ব্যাস হতে পারে ০.৬ মাইল কিংবা আরও বড়। আর এরা যদি পৃথিবীর ওপর এসে পড়ে, তা কতটা ক্ষতি করতে পারে! এ নিয়েও বিজ্ঞানীরা ভেবেছেন। আর তা ভাবলেই ভয় লাগে। বিজ্ঞানীরা একটা হিসাব করেছিলেন। আধ মাইল ব্যাসের এ ধরনের বস্তু যদি পৃথিবীকে আঘাত করে, তার শক্তিটা সাংঘাতিক। হিরোসিমা-নাগাসাকি পরমাণু বোমার কথা প্রায় সকলেরই জানা। আর তার ক্ষমতার ধারনাটা পাওয়া গিয়েছিল ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ থেকেই। আধ মাইল ব্যাসের একটা গ্রহানুর আঘাতের শক্তিটা অন্যতর পরমাণু বোমার একশ' লক্ষগুণ বেশি। আর তার ফলটা কি হতে পারে, তা সহজেই বোঝা যায়। স্বাভাবিকভাবেই এরকম একটা বিপজ্জনক বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানীদের দুশ্চিন্তা তো হবেই। তবে মহাকাশের বা বিশ্বেরএরকম নানান বিষয় আছে। তা কখনও বিজ্ঞানীদের দুশ্চিন্তায় ফেলে, কখনও বা মাতিয়ে রাখে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষায়। সেই রকমইআরেকটা বিষয়ের কথা চলেই আসে। তা হল, পৃথিবীর বাইরে প্রাণের চিহ্নের বিষয়টা। এ নিয়ে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, এটা ঠিকই। কিন্তু এ নিয়ে সাধারণ মানুষের আগ্রহও কম নয়।

এ বছরের প্রথম দিকেই পৃথিবীর বাইরে প্রাণের খবর পেতে একটা পরীক্ষা করা হয়েছে। আর তা থেকেই বিজ্ঞানীরা বেশ কিছু ব্যাকটেরিয়ার খোঁজ পেয়েছেন। যদিও এ নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে নানা মতভেদ রয়েছে। বিশ শতকের সাতের দশক। তখন থেকেই এ নিয়ে ভাবছেন বিজ্ঞানী ফ্রেড হোয়েল আর চন্দ্র উইক্রামা সিংহে। তাঁরা দুজনেই জ্যোতির্বিজ্ঞানী। আর তাঁদের ধারনা, মহাবিশ্বে প্রচুর জীবাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে। এগুলো রয়েছে ধূমকেতুতে। আর প্রতিদিন প্রায় তিনশ কিলোগ্রামেরও বেশি ব্যাকটেরিয়া পৃথিবীর বাইরে থেকে আসছে। তাঁদের ধারণা, এই ব্যাকটেরিয়াগুলো ধূমকেতুর জমা বরফের মধ্যেই থাকে। ধীরে ধীরে ধূমকেতু যখন সূর্যের কাছে আসে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই বরফ গলতে শুরু করে। ফলে জীবাণুগুলো তার থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে পৃথিবীর ওপর পড়তে থাকে। এই পরীক্ষার জন্য একটা বেলুনকে কাজে লাগানো হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের হায়দ্রাবাদ থেকেই পাঠানো হয়েছিল বেলুনটাকে। ওই দুই বিজ্ঞানীর সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিলেন। তাঁরা কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতের ইসরোর বিজ্ঞানী। পুরোপুরি নির্বীজকরণ করে কয়েকটি খালি লোহার পাত্রকে এর সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। পৃথিবী পৃষ্ঠের ওপর থেকে ৪১ কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুর নমুনা এই পাত্রে সংগ্রহ করা হয়েছিল। ২০ থেকে ৪১ কিলোমিটারের মধ্যে চারটি বিভিন্ন উচ্চতায়। বেলুনটি নামিয়ে আনার পর দুটি পাত্র বন্ধ অবস্থাতেই পাঠানো হয়েছিল

বিজ্ঞানী ডেভিড লয়েডের কাছে। ডেভিড লয়েড কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন জীবাণুবিজ্ঞানী। তাঁর মতে, এই পাত্রগুলোতে অন্য কোন জীবাণু মেশার সুযোগ পায় নি। কিন্তু নমুনায় অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গেছে। এর মধ্যে অনেক ব্যাকটেরিয়া বেঁচে আছে। আবার অনেক ব্যাকটেরিয়া মারাও গেছে।

বিজ্ঞানী হোয়েল আর উইক্রামা সিংহ এই পরীক্ষার ফলাফলে বেশ আশাবাদী। তাঁদের ধারণা অত ওপরে মাটির থেকে জীবাণু পৌঁছতে পারে না। ষোল কিলোমিটার ওপরে ব্যাকটেরিয়া পাওয়াটাই আশ্চর্যের বিষয়। কারণ ওই উচ্চতাই হল 'ট্রোপোস্ফিয়ারে'র সবচেয়ে বাইরের সীমানা, ট্রোপোস্ফিয়ারই বায়ুমণ্ডলের সব থেকে নিচের স্তর। তার শেষ সীমা পৃথিবী পৃষ্ঠের ওপরে ১৬ কিলোমিটার পর্যন্ত। যদিও ও উচ্চতারও জায়গা বিশেষে হেরফের হয়। আর এই কারণেই ৪০ কিলোমিটারের মত উচ্চতায় পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে জীবাণু পৌঁছান সম্ভব নয় বলে এই দুই বিজ্ঞানীর ধারণা।

তবে অনেক বিজ্ঞানীই তাঁদের সঙ্গে একমত নন। অত ওপরে বেঁচে থাকা জীবাণু নিয়েও অনেক মত পাওয়া গেছে। মার্ক বুরচেল একজন গ্রহসংক্রান্ত বিজ্ঞানের গবেষক। কেন্টারবুরির কেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী। তাঁর মতে, ৪১ কিলোমিটার উচ্চতায় এ ধরণের জীবাণু পাওয়ার বিষয়টি নিঃসন্দেহ আশ্চর্যের, আর যদি তা মহাকাশ থেকেই এসে থাকে, তা একটি অবাক করার মতই ঘটনা।

তবে এ নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে। ওই দুই বিজ্ঞানী এই ব্যাকটেরিয়াগুলোকে আরও বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করছেন। তাতে এদের বুঝতে অনেকটাই সুবিধে হবে।

পৃথিবীর বাইরে এ ধরণের প্রাণের খবর পাওয়ার আরও অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। মঙ্গল গ্রহে প্রাণের বিষয়েও গবেষণা করছেন বিজ্ঞানী ডেভিড উইন উইলিয়মস। তিনি 'ব্রিটিশ আন্টার্টিক সার্ভে'র বিজ্ঞানী। জীবাণুবিদ ডেভিড মঙ্গলগ্রহে একধরণের রঞ্জকদানা থাকার কথা ভেবেছেন। সেই রঞ্জকদানাগুলি অনেকটাই পৃথিবীর গাছপালার ক্লোরোপিলের মতই। এই রঞ্জকদানাগুলি থাকতে পারে কয়েকশ কোটি বছর। আর ওই দানাগুলি প্রাণের নিশ্চিত প্রমাণ। বিজ্ঞানী ডেভিডের মতে, এরকম ছোট্ট জৈব রঞ্জক প্রাণের প্রমাণ দিতে পারে।

এ ধরণের নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন বিজ্ঞানীরা। কখনও বা ছোটখাটো অনেক কিছুকেই পৃথিবীর বাইরের প্রাণের লক্ষণের আভাস বলে মনে করেন। তা নিয়েও তাঁরা চুলচেরা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন। এখনও এ নিয়ে সেভাবে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তবে বিজ্ঞানীরাও তা খুঁজে পেতে অনেক চেষ্টাই করছেন। তাঁরা হতাশ হন নি। আর সাধারণ মানুষ তো জানতেই চায় — তাহলে মহাবিশ্বে পৃথিবীর জীবজগৎ কি একা!

এরকম ঘটনা ঘটে

ছেলেটির বয়স মাত্র আঠার। ম্যাট্রিকের গণ্ডি পেরোতে পারে নি। একবার নয়, দু'দুবার অকৃতকার্য হয়েছে ম্যাট্রিকে। অথচ এই ছেলেটিরই লেখাদুটি কবিতা ম্যাট্রিকেপাঠ্যতালিকার অন্তর্ভূক্ত। ছেলেটির নাম সুকান্ত ভট্টাচার্য।

উত্তরমালা

তুমি কি স্মার্ট ?

১। কটক ২। ভাগলপুর ৩। ওরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন ৪। জন্মদিন একটাই হয় ৫। কোনটাই নয় ৬। ২ টো

জেনারেল নলেজ

১। ঘ ২। খ ৩। খ ৪। ক ৫। ঘ

কুইক কুইজ

১। পৃষ্ঠা ৫ - ব্রেন ২। পৃষ্ঠা ৩৭ - অরুণাচল প্রদেশ

আই.কিউ.টেষ্ট

১। ৩৩৩ ২। ৩০ ৩।ROMANIA ৪। টোকিও ৫। নেপাল ৬। ১৬ ৭। ছেলের মা ডাক্তার ৮। পলাশ, শিমূল, দেবদারু ৯। স্বাক্ষর

ছবিতে রহস্য কুইজ

আসল মালিক মিঃ দত্তের মুখের বাঁদিকে আঁচিল আছে। কিন্তু নকল মালিকের মুখের ডানদিকে আঁচিল আছে

ছবি কুইজ

১। মেয়েটির টুপি ২। মেয়েটির মাফলার ৩। মেয়েটির চোখের পাতা ৪। মেয়েটির জামার বোতাম ৫। বইটির নাম ৬। মেয়েটির হাতের আঙুল ৭। ছেলেটির টুপি ৮। ছেলেটির নাকের জল ৯। কুকুরের নাকের বিন্দু ১০। পাখির ঠোঁট ১১। কুকুরের কান।

শব্দছক

পাশাপাশি ঃ ১। কটক ৩। সভা ৪। দমদম ৬। রসিদ ৮ তাই ১০। তাজ ১২। সন ১৩। রস ১৫। বালক ১৮। রহমান ১৯। রাম ২০। দপ্তর

উপর-নীচ ঃ ১। কলকাতা ২। কদম ৩। সমর ৫। চাঁদ ৭। সিনর ৯। ইম্ফল ১০। তাস ১১। জন ১৪। সরকার ১৫। বাদ ১৬। করম ১৭। সনদ

শব্দছক

শতদল দত্ত

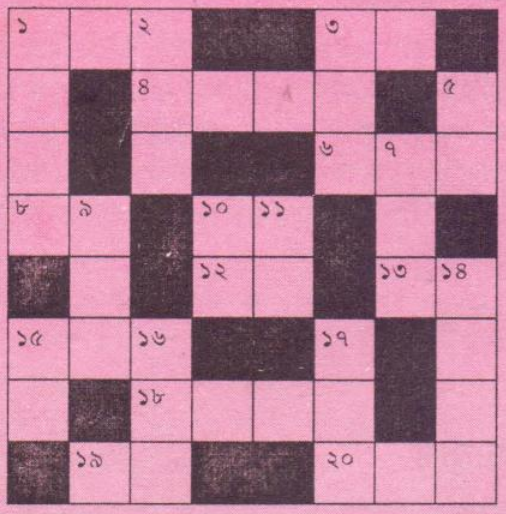

পাশাপাশি : ১. সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মস্থান খ্যাত ওড়িশা শহর ৩. ১৯৩৮ সালে সুভাষ চন্দ্র জাতীয় কংগ্রেসের '— পতি' নির্বাচিত হয়েছিলেন ৪. এই বিমান বন্দরটি নেতাজির নামে উৎসর্গ করা হয়েছে ৬. আজাদহিন্দ ফৌজের এক ক্যাপ্টেন '—আলি' ৮. নেতাজির স্মৃতি বিজড়িত '—হকু' বিমানবন্দর ১০. সুভাষ চন্দ্র পেশোয়ারের '—মহল' হোটেলে একদিনের জন্য ছিলেন ১২. সুভাষ চন্দ্র জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের অধক্ষ্য ছিলেন যেটি এগার নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে 'ফরবেশ ম্যান—' ভবনে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৩. বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স অ্যাকশন স্কোয়াডের এক পরিচালক '—ময় শূর' ১৫. আজাদ হিন্দ বাহিনীর 'বালসেনা' এদের নিয়েই গঠিত হয়েছিল ১৮. আজদ হিন্দ ফৌজের এক কর্নেল 'হাবিবুর—' ১৯. 'নওজোয়ান ভারতসভা'র সম্পাদক ছিলেন 'ভগৎ—' ২০. নেতাজি জার্মান বিদেশ '—'এ 'স্পেশাল ইন্ডিয়া ডিপার্টমেন্ট' প্রতিষ্ঠা করেন

উপর-নীচ : ১. সুভাষচন্দ্র ১৯৩০ সালে '—কর্পোরেশনে'র মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন ২. আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক সঙ্গীত 'কদম — বাড়ায়ে যা' ৩. আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম '— অভিযান' শুরু হয় ১৯৪৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ৫. কাবুলে এক ভারতীয় প্রবাসী ও সুভাষচন্দ্রের বিশেষ সাহায্য কারী 'উত্তম —' ৭. সুভাষ চন্দ্র জিয়াউদ্দিনের পর হলেন '—অরল্যান্ডো ম্যাজোট্টা', ইতালিয়ান ছদ্মবেশী নাম ৯. আজাদ হিন্দ ফৌজের কোহিমা জয়ের লক্ষ্যস্থল ছিল মণিপুর রাজধানীটি ১০. কবিগুরু '—এর দেশ' নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণ সুভাষচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছেন ১১. বার্লিনে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের পথম অধিবেশনে '— গণমন অধিনায়ক' গানটি জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হয় ১৪. নেতাজির 'আজাদ হিন্দ —' ১৫. নেতাজি 'জিন্দা—' ১৬. নেতাজি 'মোহনদাস —চাঁদ গান্ধী'কে 'জাতির জনক' বলেছেন ১৭. আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনাদের '—ই-বাহাদুরি' খেতাব দেওয়া হত। **উত্তর ৫৫ পৃষ্ঠায়**

কিশোর দুনিয়ার নিয়মাবলী

গ্রাহক, এজেন্ট ও বিজ্ঞাপন প্রতিনিধিদের প্রতি

- কিশোর দুনিয়া প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম সপ্তাহে বের হবে।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য হবে ১০.০০টাকা ও শারদ সংখ্যার মূল্য ৩০.০০ টাকা। বার্ষিক (Jan-Dec) গ্রাহক চাঁদা ১০০.০০ টাকা। শুধু গ্রাহকদের জন্য শারদ সংখ্যা Free। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পত্রিকার মূল্য ও গ্রাহক চাঁদার হার পরিবর্তিত হতে পারে। পত্রিকা সাধারণ ডাকে পাঠানো হবে। পত্রিকা কার্যালয় থেকেও পত্রিকা সংগ্রহ করা যাবে।
- মানি অর্ডার (M.O) বা ব্যাঙ্ক ড্রাফট (B.D) KISHORE DUNIYA-এর নামে পাঠাতে হবে। ঠিকানা ঃ কিশোর দুনিয়া C/O পত্রলেখা ৯/৩ টেমার লেন, কোলকাতা - ৭০০ ০০৯
- ২৫ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্টের ক্ষেত্রে অন্তত ২৫ কপির জন্য ৩০% কমিশনের ব্যবস্থা। খুচরো বিক্রের ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের জন্য অন্তত ১০ কপির জন্য ২০% কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

লেখক ও পাঠকদের প্রতি

- ৫-১৬ বছর বয়সের শিশু ও কিশোরদের উপযোগী রচনা কিশোর দুনিয়ায় প্রকাশের জন্য পাঠানো যেতে পারে। রচনার শেষে লেখকের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা প্রয়োজন। পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন রচনার জন্য লেখকরা দায়ী থাকবেন, সম্পাদক নয়।
- প্রতিটি রচনার জন্য অ-ফেরৎ যোগ্য সম্ভাব্য ছবি পাঠাতে হবে। প্রেরিত যে কোন রচনাই সম্পাদিত হতে পারে।
- 'কিশোর প্রতিভা' বিভাগে প্রকাশের জন্য ৫-১৬ বছর বয়সের যে কোন শিশু ও কিশোর তাদের লেখা গল্প, কবিতা, জোকস্ ও নিজেদের হাতে আঁকা ছবি পাঠাতে পারে।
- যে কোন লেখা পাতার একদিকে লিখতে হবে এবং হাতের লেখা স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- কিশোর দুনিয়ায় প্রকাশিত রচনাগুলি প্রয়োজনে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার অগ্রাধিকার কিশোর দুনিয়া ও কিশোর দুনিয়া প্রকাশনীর থাকবে।

সম্পাদকীয় ও অন্যান্য যোগাযোগের জন্য ঃ কিশোর দুনিয়া C/O পত্রলেখা ৯/৩ টেমার লেন, কোলকাতা - ৭০০ ০০৯

ফোন ঃ ২১৯-৬৬১১

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

KEJRIWAL ELECTRONICS LTD.

06, Narkeldanga Main Rd. Kol - 700054. Ph: 352 9057/8550

'কিশোর দুনিয়া'র সাফল্য কামনা করি :

শিশু সাহিত্যের অগ্রণী প্রকাশক

নির্মল বুক এজেন্সী

কলকাতা - ৭

২০০২ সালের বইমেলা বিশেষ আকর্ষণ

- স্বামী কৃষ্ণানন্দের
  জননী সারদামণি (২য় খণ্ড) ৮০/
- ডঃ প্রমথ নাথ মন্ডলের
  সংখ্যা শব্দ ঃ কথনে ও লিখনে ৬০/
  আধুনিক প্রবাদ ও প্রবচন ৭০/
- মদন মোহন গুপ্তের
  হিটলার ও নেতাজী ৬০/
- তাপস মুখোপাধ্যায়ের
  বিজ্ঞান যখন ভাবায় ২২/
  গোপুমামার কান্ড কারখানা ২৫/
- পৃথ্বিরাজ সেনের
  সমুদ্র শয়তান ৩০/
  আগাথা ক্রিস্টির কিশোর গল্প ৪০/
  শার্লক হোমসের কিশোর গল্প ৪০/
- শম্পা দে'র
  ছবিতে নীতিমালা ৩০/

সঞ্জীব প্রকাশনী

১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা - ৯

ফোন ২৪১ ৭৫১৩

কিশোর দুনিয়া বুক কার্ড

বই কেনো

৩০ শতাংশ

ছাড়-এর সুযোগে

শুধু মাত্র গ্রাহকদের জন্য

যারা বয়সের দিক থেকে **শিশু ও কিশোর**

এবং

যারা মনের দিক থেকে **শিশু ও কিশোর**

তাদের সকলের জন্য নতুন স্বাদের রঙিন মাসিক পত্রিকা....

ছোটদের নতুন স্বাদের রঙিন মাসিক পত্রিকা

কিশোর দুনিয়া

- প্রচ্ছদ কাহিনী
- বিশেষ রচনা
- গল্প
- ছড়া ও কবিতা
- কমিকস্
- ছবিতে রহস্য কুইজ
- ছোটদের পাতা 'প্রতিভা'
- স্বাস্থ্য
- খেলাধুলো
- জেনারেল নলেজ এ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স
- বিজ্ঞানের লেটেস্ট তথ্য
- ওয়েব সাইটের ঠিকানা
- পড়াশুনো
- কেরিয়ার
- ছবি কুইজ
- কুইক কুইজ
- জোকস্
- শব্দছক

উপদেষ্টামণ্ডলীঃ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
পার্থ দে, সবিতেন্দ্রনাথ রায়, সুব্রত দাস

আজই গ্রাহক হয়ে যাও

৯/৩ টেমার লেন (কলেজ স্ট্রীট), কলকাতা ৯, দূরভাষ : ২১৯ ৬৬১১